যোজনগন্ধা সত্যবতী

যোজনগন্ধা সত্যবতী

প্রকাশন

৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রকাশক : অমিতা চট্টোপাধ্যায়
আশীর্বাদ প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রথম প্রকাশ : ৩০ জানুয়ারি ১৯৬১

উপদেষ্টা :
অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়ান স্মল ইণ্ডাস্ট্রি,
বিজনেস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট

অলংকরণ : গোপাল সান্যাল

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : বিজন কর্মকার

মুদ্রক : অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণি (ব্লক কে-১)
কলকাতা ৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

যোজনগন্ধা সত্যবতী

সত্যবতীর মনে শান্তি নেই। মনের অতলে নিরন্তর নানাবিধ যে প্রতিক্রিয়া হয় তার ছাপ পড়ে মুখে। তাই এক যন্ত্রণাবিদ্ধ কষ্টে মুখখানা মলিন হয়ে থাকে। কিন্তু মনের সে খবর নেয়ার লোক নেই তার। সত্যবতী রাজ অন্তঃপুরে একেবারেই একা। অনেকটা বন, নদী, পাহাড় প্রান্তরের মত একা। তাদের অন্তরে ভালবাসার দাহ নেই, যন্ত্রণা নেই। কিন্তু একজন মানুষ তো অনেক মানুষের মধ্যে বাস করে। তাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করেই সে বাঁচে। কিন্তু সেখানে টান ধরে যখন পাওয়ার ঘর শূন্য হয়ে যায়, তখন তার মত দুঃখী আর কেউ হয় না। শূন্যতা শুধুই শূন্যতা -- ঘরে বাইরে চারধারে। অনুরূপ এক গভীর শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে কেবলই মনে হয়, তার আসল ঝগড়া ভীষ্মের সঙ্গে। কিন্তু সে বিরোধ প্রকাশ্যে টেনে আনতে চায় না। মনের অতলে

বৈরিতার আগুন। নেভা আগ্নেয়গিরির মত তাপ বিকীরণ করতে থাকে।

সত্যবতী ভাল করেই জানে ভীষ্মের সঙ্গে ঝগড়া করে সংঘাতের নিত্য নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা যায়, কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই তার। তাই রাজ অন্তঃপুরে পিতৃহীন নাবালক সন্তান, আত্মীয় কুটুম্ব পরিচর্যায় এবং সংসার রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিল। সপত্নীপুত্র ভীষ্ম থাকত নিজের বহির্জগতে বেশি সময়, পিতার অবর্তমানে হস্তিনাপুরের রাজনীতি, জননীতি এবং ক্ষমতানীতির ক্রমবর্ধমান পরিসরে। তখন রাজনীতিতে ক্ষমতার উন্মাদনা অনুভব করত না সত্যবতী। পুত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বের পরিধি ছিল সীমিত। কোনদিন ভীষ্মের সঙ্গে দুর্নিবার সংঘাতের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনা থাকতে পারে একথা সত্যবতীর মনেই হয়নি। ভীষ্মের কার্যকলাপে সে ছিল মোটামুটি সন্তুষ্ট। প্রথমে জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রাঙ্গদ এবং পরে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু তার সব হিসেব গোলমাল করে দিল। সেই প্রথম ভীষ্ম সম্পর্কে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ জাগল। সত্যবতীর বিশ্বাস ভীষ্ম খুব সংগোপনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কাজ করে চলেছে। পথের কাঁটা ভেবেই সিংহাসনের প্রকৃত দুই উত্তরাধিকারীকে এমন করে সরিয়ে দিল যে কেউ তাকে অপরাধী ভাবতে পারবে না। তাদের না বাঁচার জন্য ভীষ্মকে ভয়ানক শত্রু মনে করে সে। শুধু ভীষ্মের জন্যই তার জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেল। বোধহয় তাকে বেশি বিশ্বাস করে যে শুধু ঠকেনি, হেরেছেও।

কথাগুলো বড় দেরি করে বুঝল সত্যবতী। সময়ের মধ্যে নিজের ভুল না বুঝলে সে বোঝার কোনও অর্থ থাকে না। সব বোঝাই তখন নিরর্থক হয়ে যায়। মেয়েরা বড় নির্বোধ আর বোকা। বিশ্বাস করে ঠকে এবং হারে। তাদের সব আস্থা, ভরসা, ধারণাকে কোনো চালাক মানুষ তার অজান্তেই চোখের সামনে ধারাল বুদ্ধি দিয়ে ইঁদুরের মতো ইতর দাঁতে কেটেকুটে ছিন্নভিন্ন করে। ভীষ্মের মতো ভালো ছেলে যে কখনও সেরকম কিছু করতে পারে, এইটাই সে বোঝেনি। এখনই মনে হচ্ছে, জীবনের অনেক কিছু বুঝতে সময় লাগে জীবনভর। আর তার সব বিশ্বাস ভাঙতে লাগে একমুহূর্ত।

অনেক অভিজ্ঞতা দিয়ে সে বুঝেছে, রাজনীতি বড় কঠিন খেলা। এখানে সত্য, মিথ্যে, ন্যায়, অন্যায় পাপ পুণ্যের স্থান নেই। রাজনীতির মূল কথাই হলো প্রতিপক্ষকে হারানো এবং নির্মূল করা। ভীষ্মও কূটকৌশলে হারিয়ে দিল তাকে। একা থাকলে এই অনুভূতিটা কুরে কুরে খায় অনুক্ষণ। আর তখন অনেক কথা মনে পড়ে যায়। সুদূর অতীতকে তখন দেখতে পায়।

জীবনের রূপ-রঙ-ছন্দ সব হঠাৎই নিজের অজান্তে বদলে যায়। অথচ এই বদলে তার নিজের কোনো ভূমিকা ছিল না। সে শুধু সময় প্রবাহে ভেসে গেছিল। কাল

সবেগে শুধু আকর্ষণ করে তার দিকে। গোটা জীবনটাই তার মহাকালের এক অপ্রতিরোধ্য সৃষ্টি। মহাকাল সত্যিই তাকে নিয়ে কী করতে চায় সে নিজেও ভালো করে জানে না। একাকীত্বের মধ্যে যখন নতুন কোন তরঙ্গ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তখন ভাসতে ভয় লাগে, চেনা গণ্ডীর বাইরে পা দিতে সাহস হয় না। তবু জীবনের অন্য এক আলোকিত প্রান্তরের দিকে হাতছানি দিয়ে কে যেন ডেকে নেয় তাকে। মনের আলোয় আভাসিত হয়ে ওঠে তার অতীতটা। অনেক কথাই মনে পড়ে সত্যবতীর। অনেক বছরের গণ্ডি নিমেষে পার হয়ে গেল। সে দেখতে পাচ্ছিল চতুর্দশী মৎস্যগন্ধাকে। পঞ্চাশ বছরে পা রেখেও পঁয়ত্রিশ বছর আগের জীবনকে দেখতে পাচ্ছিল। বুকের মধ্যে প্রথম প্রেমের কল্লোল শুনতে পেল।

কল্লোলিনী যমুনার উচ্ছল তরঙ্গ প্রাণের খুশিতে ভরপুর তখন। বসন্তের হাওয়া রতিরঙ্গে মেতেছে তার সঙ্গে। ভুবনমোহিনী যৌবনগর্বিতা নটীর মত সেও চলেছে অভিসারে। তন্ময় হয়ে মৎস্যগন্ধা যমুনার ঢেউ দেখছিল। রোজই দেখে। তবু এই নদীর কত কী দেখা হয়নি, কত দৃশ্য অদেখা রয়ে গেল। আজ তার বুকের ভেতর কেমন যেন ঢেউ-এর উন্মাদনা জাগল। ঢেউগুলো এ ওর গায়ের ওপর পড়ে হাসতে হাসতে কৌতুকে অশেষ আনন্দ করতে করতে চলেছে যেন। কোথায় যে চলেছে তারা, কে জানে? তবু ওই চলমানের সঙ্গে সঙ্গে তার মনটাও চলতে ইচ্ছে করে। শুধুই চলার মধ্যেও বোধহয় একধরনের আনন্দ আছে।

নির্জন নদীতীরে সে ছাড়া আর কেউ ছিল না। তবু পরাশরের সন্ধানী দৃষ্টি ঠিক তাকে খুঁজে নিল। নদীর ওপর হেলে পড়া একটা বাবলা গাছের সঙ্গে বাঁধা মাছ ধরা ডিঙিতে স্তূপাকৃত একরাশ অগোছালো জালের মধ্যে সে চুপ করে বসেছিল। পরাশর তার দিকে এগিয়ে গেলে চার চোখে মিলন ঘটল। অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে না পেরে মুখ নিচু করল। দুরন্ত লজ্জায় সে রঙিন হয়ে উঠল।

পরাশর মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকেই দেখছিল। এক পা এক পা করে তার দিকে যেতে যেতে হোঁচট খেল। পড়তে পড়তে কোনরকমে সামলে নিল নিজেকে। তাই দেখে মৎস্যগন্ধা হেসে ফেলল। উচ্চকিত শব্দ করে হাসল। উলুধ্বনির মত সে হাসি যমুনার তরঙ্গের মত চলকে চলকে চলে। চারদিকে হাসির রঙ, লাবণ্য উপচে পড়ে যেন অবলীলায়। তার ঝঙ্কার এবং শ্রুতিমাধুর্য ছিটকে গেল চতুর্দিকে। বিদ্যুৎচমকের মত পরাশরের অনুভূতি উদ্ভাসিত ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান হয়। তার সমস্ত হৃদয় মুহূর্তের মধ্যে গন্ধবতীর দিকে ধাবিত হয়। তখন হুঁশ ছিল না তার। অনাস্বাদিতপূর্ব এক সুখের অনুভূতিতে তার হৃদয় পুড়তে লাগল। খুব কাছে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখ করে ডাকল

পরাশর। মৎস্যগন্ধা, আমি পরাশর। তুমি আমাকে ভুলে গেছ, কিন্তু আমি ভুলিনি। দেখেই চিনেছি। সেই চোখ, সেই মুখ, নাক, গায়েব রঙ, হাসি এসব তো লুকনো যায় না।

পরাশরের কথা শুনে গন্ধবতীর হাসি কখন মিলিয়ে গেছে সে নিজেও জানে না। হাঁ, হয়ে ঋষিকে দেখতে লাগল। পরাশর তার থমথমে নীরব নিথর দুই চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, চিনতে পারনি তো!

মৎস্যগন্ধা নঞর্থক মাথা নাড়ে। পরাশর বলল : তোমাকে কুড়িয়ে পেয়ে আমি দাসরাজার কাছে গচ্ছিত রেখে গুরুগৃহে বেদ-অধ্যয়ন করতে যাই। চোদ্দ বছর পরে স্বপ্নে তোমাকে দেখলাম। ঘুম ভেঙে গেলে এক নতুন মনের সূচনা হল। নিজেকে প্রশ্ন করলাম আমার হৃদয় সমুদ্রে এ কিসের কল্লোল? কোথা থেকে এ তুফান এসে জীবনের মূল ধরে টান দিল?

তারপর এক গভীর তীব্র ভালো লাগায় পরাশর নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো সোহাগ গলায় বলল : মৎস্যগন্ধা তোমাকে ভীষণ ভালো লাগছে আমার। যৌবন তোমাকে সুন্দর করেছে। আজ তোমার কাছে আমার অনেক দাবি। একদিন যে জীবন রাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষা করেছি, সেই জীবন আমার বাঁচার জন্য চাই। লজ্জায় নিজেকে তুমি লুকিয়ে রেখ না। রাখলে আমি বাঁচব না। অনেক পথ হেঁটে, পাহাড ডিঙিয়ে নদী পার হয়ে তোমাকে দেখব বলে এসেছি। এখন কী ভালো লাগছে আমার।

মৎস্যগন্ধার সব কথা হারিয়ে যায়। বিষম লজ্জা তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। অন্তর্বাসহীন বুকের উপর কাপড়খানা টেনে দিয়ে পরাশরকে দেখতে লাগল। পরাশরের বয়স হলেও যৌবনোচিত আকর্ষণ তার চোখ দুটিকে আটকে রাখল। আর তাতেই তার বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। পরাশরেরও চোখের পলক পড়ছিল না। সময়ের গতি তখন দুরন্ত।

কোথা থেকে কি হয়ে যাচ্ছিল দু'জনেব ভেতর ভালো করে বোঝার বোধশক্তি ছিল না। এক অবোধ রহস্যময় নিবিড় অনুভূতি তাদের চেতনাকে একটু একটু করে আচ্ছন্ন করছিল আর তারা নিবিড় আশ্লেষে একে অপরকে পাওয়ার এক অনাস্বাদিত গভীর সুখানুভূতিব মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগল। কী দ্রুত একটার পর একটা ঘটনার মধ্যে তারা প্রবেশ করছিল। সমর্পণের আবেগে উভয়ে ব্যাকুল তখন, ভাবার সময় কোথায়? প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে রক্তে তখন দুরন্ত তৃষ্ণা, কোষে কোষে নিবৃত্তির ক্ষুধা। ডিঙির দড়ি খুলে পরাশর স্রোতের মুখে ঠেলে দিল। ভেসে গেল মাঝদরিয়ায়। অভিনব আদর, অনাস্বাদিত জীবন, চমৎকার আনন্দ, শরীরে মনে নতুনত্বের স্বাদ কানায়

কানায় ভরে যাচ্ছে, সারা শরীর যেন গান গেয়ে উঠছে। সঙ্গম সুখের প্রার্থনায় জীবনের মানেটা হঠাৎই আবিষ্কার করল সাহসের সঙ্গে। মহিষকালো স্তূপাকৃতি জালের উগ্র আঁশটে গন্ধের সঙ্গে মিশল তাদের গায়ের গন্ধ। চারপাশে ছড়ানো জালের স্তূপ তাদের আড়াল করল। শুকনো জালের মরমর শব্দের সঙ্গে সঘন নিঃশ্বাসের শব্দ যমুনার কল্লোল মিলে মিশে একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ যমুনার তরঙ্গের মতই উন্মত্ত উৎসারে ধেয়ে গেল তাদের শিরায় শিরায়।

তখনই এক বুক ভাঙা নিঃশ্বাস পড়ল সত্যবতীর। আর তাতেই চমকাল সে। বহুকাল পরে চতুর্দশী তরুণী মৎস্যগন্ধাকে দেখল। পঁয়ত্রিশ বছর পরেও চতুর্দশী আছে সে। একটুও পরিবর্তন হয়নি। কালও তাকে ছোঁয়নি। উৎসুকী কৌতূহলী মনটা কেবল তাকে নতুন করেছে। পঁয়ত্রিশ বছর পরে জীবনের প্রথম পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? সম্পর্কটা বোধ হয় তার সন্তানের মধ্যে বেঁচে আছে। বুকের মধ্যে দপ করে স্মৃতির দীপ জ্বলে ওঠল। গাঢ় কুয়াশার মধ্যে ছায়াবৃত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে পরাশর। মুখে সেই অনির্বচনীয় হাসি। বলল : প্রিয়তম, এক দারুণ সংকটের মধ্যে তোমার দিন কাটছে। মহারাজ শান্তনুর নজর পড়েছে তোমার ওপর। কল্মাষপাদ রাক্ষসের মতো তোমাকে গ্রাস না করা পর্যন্ত সে নিবৃত্ত হবে না। রাজার পথ আগলে দাঁড়ানোর মত আমার কী আছে, যা নিয়ে তোমাকে রক্ষা করব। আমাদের চলার পথ এখন আলাদা। তোমার পথ তোমার, আমার পথ আমার। যে যার পথে একা চলব মনের চোখকে ঢেকে রেখে। তোমার চলার পথে সবচেয়ে বড় বাধা দ্বৈপায়ন। তাকে নিয়ে আমি চলে যাব মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ চলে গেছে সেইদিকে। তুমিও কুমারী হয়ে যাবে। তোমার কোন ঝঞ্ঝাটই থাকবে না।

অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন তুলোপেঁজা হয়ে যেতে যেতে যোজনগন্ধা হঠাৎই ডুকরে কেঁদে উঠল। পরাশরের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল : চুপ কর। আমি আর শুনতে পারছি না। বিশ্বাস কর, আমি কোনও দোষ করিনি। তবু বিশ্রী কথাগুলো আমাকে শুনতে হচ্ছে। অনুযোগ অভিযোগের একটা সময় থাকে। আমিও যে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছি একবারও সেকথাটা ভাবলে না। সারাজীবন তো কল্মাষপাদ রাক্ষসদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটালে। পারলে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে? দৈত্যের মতো হানা দিয়ে মহারাজ শান্তনু যখন আমার জীবনটাকে তছনছ করে দিচ্ছে, আমার চারপাশের জীবন ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যখন বীতশ্রদ্ধ হয়ে মনটা কিছু করতে চাইছে, তখন তুমি আমাকে তিরস্কার করছ? কী সাংঘাতিক মানুষ তুমি!

চমকে পরাশর যোজনগন্ধার চোখের উপর চোখ রাখল। বলল, জ্বলে মরছি আমি

সেই অপরাধের গ্লানিতে, তোমাকেও ছিন্নভিন্ন করেছি। এ আমার দোষ, অন্যায়। হাত ধরাধরি করে তোমাকে নিয়ে পালাতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম। কিন্তু ভেতরের ইচ্ছেটা কিছুতে বাইরে করা সম্ভব হচ্ছে না বলে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করছি। কল্মাষপাদ রাক্ষসদের হারিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু মেরে ফেলা যায় না। আমাদের সুখশান্তির উপর হানা দিয়ে একটা সুন্দর সুখী জীবনকে নষ্ট করে দেয়। তাই, আমি যা পারিনি আমার সন্তানকে তাই করতে শেখাব। অবিচারকে অবিচার দিয়েই মুছতে হয়। অন্যায় দিয়েই অন্যায়কে সরাতে হয়। অন্যায়, অবিচার পন্থা হিসেবে দারুণ। বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুলের যেমন কোন বিকল্প হয় না। সেরকম তোমার নামের বন্ধনের টানেই তোমার পুত্রও আপদে, বিপদে সংকটে সর্বক্ষণ তোমার সহায় হবে এবং পাশে থাকবে। হেরে গিয়েও জেতা যায় যোজনগন্ধা। বাঁচার মত বাঁচার জন্যই শান্তনুর কাছে হেরে গিয়ে তোমাকে সামনে রেখে আমার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। জীবন মানেই বেঁচে থাকা, সবটাইত বর্তমান—এই মুহূর্ত থেকে পর মুহূর্ত পর্যন্ত।

বুকের গভীর থেকে একটা লম্বা শ্বাসের সঙ্গে গভীর খেদে স্বগতোক্তির মত করে উচ্চারণ করল যোজনগন্ধা। মানুষের মত সব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া জীব, বিধাতা আর একটিও তৈরি করেনি।

বিধাতার এ এক কঠিন পরিহাস। কষ্টে উচ্চারণ করল পরাশর।

অনেক পুরনো কথা। তবু কী আশ্চর্য! সব সেরকমই আছে। একটুও বদলায়নি। এমন কি সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে। কাল তাকে জীর্ণ করতে পারেনি। কোথাও কোনো দৈন্য নেই। তবু এতকাল পরে এতসব কথা মনে হয় কেন? পিতা দাসরাজের কথাগুলো হঠাৎই মনে পড়ল। মানুষ নিজেই তার ভবিষ্যতের রূপকার। দুঃখকে আনন্দ করার ভার তার নিজের হাতে।

সত্যবতীর ভাবনাটা থমকে যায়। কিন্তু গন্তব্য জানা না থাকলে সাফল্যের মধ্যেই এক গভীর ব্যর্থতা থেকে যায়। তবু এসব ভাবনার মধ্যে একটা কিছু অন্বেষণ করছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, একটা কিছু হবে, কিছু ঘটবে জীবনে, একটা মোড় ফিরবে নিশ্চয়ই! নইলে এতকাল পরে এমন করে অতীতের কথা মনে পড়বে কেন? এই যে একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণে : বর্তমান. ভবিষ্যতের সঙ্গে মিশে অতীতকে মনে পড়ল, সে তো শুধু স্মৃতি নয়, মনে পড়া নয়, বাস্তব অনুভূতি। এক স্বপ্ন দৃশ্য যেন। অন্ধকারের ভিতর থেকে পঞ্চমবর্ষীয় দ্বৈপায়নের শরীরটা ফুটে উঠেছে। অবাক হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। এক মায়াবী আলো ঘিরে আছে তার মুখমণ্ডলে।

তখনই মনে হলো, এই পুত্রই সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারে তাকে। একমাত্র ছেলের কাছে মায়ের কোন লজ্জা নেই। মনের কথা অকপটে শুধু তাকেই বলা যায়। নিজেকে উন্মোচিত করার এমন নিরাপদ জায়গা খুব কম আছে। তার সঙ্গে ছত্রিশনাড়ীর বন্ধন। শুধু কি তাই, উভয়ের ধমনীতে যে রক্তস্রোত বইছে, তার উপর দাবি করার পুরো অধিকার তার আছে। পুত্র দ্বৈপায়নই এ নির্বান্ধব শত্রুপুরীতে তার একান্ত কাছের মানুষ। হয়তো সে কারণেই তার ওপর বেশি নির্ভর করছে। একমাত্র দ্বৈপায়নকে সামনে রেখে সত্যবতী তার নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে চাইল। এবং পরিবারের অভ্যন্তরে তার গুরুত্ব ও প্রভুত্বকে বাড়িয়ে তোলা খুবই জরুরী মনে করল। সে কারণে সত্যবতী খুব সাবধানে চতুর্দিক গুছিয়ে সুকৌশলে পুত্র দ্বৈপায়নকে কৌরব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার এক ছক আঁকল।

মনের আলোয় আলোয় আভাসিত হয়ে ওঠে এক অনাগত ভবিষ্যৎ। বীজের মত লুপ্ত আছে মনের ঘরে। সেই বীজ অঙ্কুরিত না হলে তো গাছ হয় না। বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য কতকগুলো অবস্থার দরকার। সেই অবস্থাগুলোর ভেতর দিয়ে না গেলে গাছ ফুলে ফলে ভরে ওঠে না। অনেক কিছু উৎপাত, উপদ্রব আর ভয়ের এলাকা পার হয়ে তবেই গাছে ফুল ধরে, ফল হয়। মানুষের কামনা, বাসনা, আকাঙক্ষা পূরণও অনেকটা বীজ অঙ্কুরিত হওয়া এবং গাছে ফল ধরারই মত। আসল কথা হলো, মনের মধ্যে আকাঙক্ষা পূরণের জন্য, প্রত্যাশার পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারলে একজন ব্যর্থ মানুষও প্রচণ্ড সফল হতে পারে। উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও ইচ্ছে ঠিক থাকলে একজন খঞ্জও দুর্গম পাহাড়ের শীর্ষে উঠতে পারে। বারংবার মনে হতে লাগল জীবনের সব ঘটনারই একটা মানে আছে। পরাশরের সঙ্গে প্রেম, মিলন, সন্তান, শান্তনুর প্রণয়, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের অকাল মৃত্যু প্রভৃতির উপর তার কোন হাত নেই। তবু এসব কিছু না ঘটলে হয়তো দ্বৈপায়নের জন্য এই প্রতীক্ষা তার থাকত না। তাকে একান্ত করে কাছে পাওয়ার এই সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি হত না। এসব কথা মনে হলেই মনের মধ্যে ঝড় ওঠে। ঝড় উঠলেই সেই উথাল পাথাল দরিয়াতে তার অসহায়তা তার হতাশা সম্বন্ধে সে সচেতন হয়। আর তখনই পুত্র দ্বৈপায়ন ছাড়া অন্য কারো কথা মনে হয় না।

দ্বৈপায়নের আকস্মিক 'মা' ডাকে সত্যবতীর তন্ময়তা ভঙ্গ হল। শাঁখের মত বেজে গেল তার ভেতরটা। উন্মুখ প্রতীক্ষার অবসান হল। কতকাল পরে দেখল তাকে। পঁচিশ বছরে কত বদলে গেছে দ্বৈপায়ন। বাল্যের সেই মুখখানা শ্মশ্রু, গুম্ফের মধ্যে চাপা পড়েছে। তবু আত্মজ বলেই রক্তের টানে তাকে চিনল। এক গহীন চিরপ্রদোষের দ্যুতি

ছড়িয়ে আছে তার মুখমণ্ডলে। মুগ্ধ সত্যবতীর বিহ্বল দুটি চোখ এক দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে উঠল। দ্বৈপায়ন তার ছেলে। তারই ছেলে! প্রথম প্রণয় কুসুম। দু'হাতে তাকে টেনে নিল বুকে। আতসবাজির মত নানা রঙের বিস্ফোরণ ঘটে গেল সেখানে। পুত্রের লোমশ বুকের ওপর মুখ ডুবিয়ে সারা গায়ের ঘ্রাণ নিল। বলল, জানতাম, তুমি আসবে। সব কুশল তো!

দ্বৈপায়নও অভিভূত বিহ্বল। এক অনাস্বাদিতপূর্ব পুলকে ভরে যেতে লাগল তার ভেতরটা। নিজেকে প্রকাশ করার কোন.অভিব্যক্তি ছিল না তার। কিন্তু তার চোখের তারায় ফুটে উঠল এক নীরব সহমর্মিতা। জীবনের অনেক কথাই মনে পড়ল। কিন্তু আজ তা দূর জ্যোতিষ্কের মতো অনেক দূর সরে গেছে। তার দ্যুতি পড়ে মনটা উজ্জ্বলিত হয় না। তবু মায়ের নিবিড় বাহুবন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থেকে এক অভিনব আবেগ জাগল। বলল : আমায় ডাকলে কেন মা?

সত্যবতীর হঠাৎ সব তালগোল পাকিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ তার চোখের ওপর চোখ রেখে স্থির হয়ে রইল। তারপর একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল জোরে, সশব্দে। দ্বৈপায়ন একটু চমকে উঠে বলল : মা তোমার নিশ্বাসে ব্যর্থ জীবনের হাহাকার আমাকে আকুল করে তুলছে।

কথাটা শুনে সত্যবতীর গায়ে কাঁটা দিল। দেহমন জুড়ে সুরের কল্লোল। মনে হল, আর সে একা নয়। তার পাশে আছে সুযোগ্য পুত্র। এই কথাটা অনেকক্ষণ ধরে তার মনে যাওয়া আসা করল। বারংবার মনে হতে লাগল, পুত্রের হাত ধরে বাধা বিপত্তির সিঁড়ি ভেঙে সকলের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।

দরজায় খিল দিয়ে সত্যবতী, পুত্রের হাত ধরে পালঙ্কে এনে বসাল। আস্তে আস্তে বলল : পুত্র এক দারুণ সংকটের মধ্যে দিন কাটছে। আমি নিজের জন্য কিছু চাই না। তোমার সহোদর বিচিত্রবীর্যের কোনো সন্তানাদি নেই। অথচ, আমি ভীষণভাবে চাই তার বংশধরের হাতে এ সিংহাসন অর্পণ করতে। কিন্তু না করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। আমার সে সাধ পূরণ করতে পার না তুমি?

দ্বৈপায়ন একটু অবাকই হল। বলল : মা, আমি সন্ন্যাসী। আজন্ম ব্রহ্মচারী। তোমার বাসনা পূরণ করি কেমন করে?

পিতার আদেশ পালন করতে পরশুরাম গর্ভধারিণী জননীকে কুঠারঘাত করতে একটুও দ্বিধা করেনি। মাতা বলেই কি অবহেলার পাত্র। পিতার আদেশে যা করা যায়, মায়ের নির্দেশে তা করার কি কোন বাধা আছে?

থমথমে গম্ভীর গলায় দ্বৈপায়ন বলল : কী হয়েছে তোমার?

অভিমান হল সত্যবতীর। বলল : তুমি পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম করতে যাও। তুমি সন্ন্যাসী, আজন্ম ব্রহ্মচারী। তোমার কাছে প্রত্যাশা করা অন্যায় হয়েছে আমার।

দ্বৈপায়নের অধরে স্মিত হাসি। বলল : অনেককাল পরে মাকে ফিরে পেয়ে আর মা-হারা হয়ে থাকতে চাই না। তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। কথা বলছ না কেন মা।

দুঃখ কষ্ট বঞ্চনা মানুষকে সুস্থ রাখে না। বুকের আগুনে পুড়ছে আমার আশা, আকাঙক্ষা, স্বপ্ন, বাসনা—সব। পাষাণ দেবতার সাধ্য কি সে আগুন নেভায়? কেবল তোমার মত ঋষিই পারে এ আগুন নেভাতে।

মাগো, আমার ওপর তোমার এই বিশ্বাসের হেতু কি জানতে পারি?

পুত্র, কার ওপর কিভাবে বিশ্বাস সৃষ্টি হয় বিশ্বাসকারী নিজেও জানে না। কিন্তু আমার তোমার জীবনের ওপর যা ঘটে তার প্রতিক্রিয়া থেকেই হয়তো এ বিশ্বাস জন্মেছে। বিশ্বাস মানেই অন্য এক আশ্রয়ের সন্ধান, একটা নির্ভরতা। বোধ হয় একটি অদৃশ্য শক্তির দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত। কিংবা কালচক্রের আকর্ষণেই তুমি আমি একত্র হয়েছি। পুত্র, তোমার পিতা একদিন বলেছিল : যোজনগন্ধা, তুমি মহাকালের যজ্ঞের এক সমিধ। আমি, শান্তনু, ভীষ্ম তার ইন্ধন, আর পুত্র দ্বৈপায়ন হল দৈবের কর্মকাণ্ডের মহাঋত্বিক. মনে হচ্ছে, সত্যদ্রষ্টা পরাশরের ভবিষ্যৎবাণী আজ সত্য হতে চলেছে। আমাদের সকলকে নিয়ে মহাকাল আর্য-অনার্য বিদ্বেষ এবং ঘৃণার এক প্রতিশোধ নেবে।

দ্বৈপায়নের অধরে অনির্বচনীয় হাসি কৌতুকে বর্তুল হল। বলল : মা, বুকের আগুনে তুমি জ্বলছ। তোমার মনটা আজ ভীষণ অশান্ত। একটুতেই প্রগলভ হয়ে পড়ছ।

সত্যবতী তৎক্ষণাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল : না। দেবতার তৈরি বিচিত্র ছলনার জালে বাঁধা পড়ে গেছে আমাদের ভাগ্য। আর বোধ হয় মুক্তি নেই।

মাতা ও পুত্রের মধ্যে নীরবতা স্তব্ধতাকে গভীরতর করে তুলল। অনেকক্ষণ পরে ত্যবতী তার উদ্বেগের ওপর খুব সন্তর্পণে একটা একটা করে কথা বসাতে লাগল। রু করল অনেক আগে থেকে। বলল, পুত্র এই দুনিয়ায় মানুষ চেনা সহজ নয়। কদিন পিতার বাসনা পূরণ করতে দেবব্রত নিজের কামনা ডালি দিয়েছিল। ংহাসনের দাবিও ত্যাগ করেছিল। আমাকে মা বলে ডেকেছিল। আমরা উভয়ে মবয়সী। তবু মাতৃজ্ঞানে আজও আমাকে সমান শ্রদ্ধা করে সে। আমার আজ্ঞা ছাড়া কান কাজই করে না। তবু মনে হয় সে অত্যন্ত ধূর্ত এবং চালাক। তোমার সহোদর ই ভাই চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তার সম্পর্কে আমার

বিশ্বাসগুলি কেমন দুর্বল হতে লাগল। নানারকম সংশয়ে অবিশ্বাস ক্রমেই তা জটিল হয়ে উঠছে। কেবলই মনে হয়, বিশ্বাস করে তাকে ভুল করেছি। ভীষ্ম তার নিজের বঞ্চনা থেকে সুকৌশলে জয় আদায় করে নেয়ার এক বিচিত্র ফন্দী এঁটেছে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করে পিতার বিশাল সাম্রাজ্যের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করে চলেছে। ভীষ্মই সর্বেসর্বা। কুরুজাঙ্গালের অধিপতিরূপে প্রতিবেশী দেশের নরপতিরা তাকে সমীহ করে, মান্য করে। গোটা হস্তিনাপুর কার্যত তার আদেশ ও নির্দেশে চলে। নাবালক ভ্রাতাদের প্রতিনিধি হয়ে সে শুধু গোটা দেশটা শাসন করছে না তার প্রকৃত শাসক হয়ে বসেছে। চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য বেঁচে থাকতে আমি তার কার্যকলাপের দিকে ফিরেও তাকাইনি। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি, রাজ্য বিস্তারেব জন্য কী করলে ভাল হয় ভীষ্ম একাই স্থির করত। আমি কিছু বুঝতাম না। বোঝার কোনদিন প্রয়োজন হবে মনেও হয়নি। পুত্রদের অকাল মৃত্যু হওয়ার পরে আমি হিসেব নিকেষ করতে বসেছি। আমার পাওয়ার ঘর শূন্য হয়ে গেছে। আমি একেবারে একা হয়ে গেছি। আমার সর্বস্ব এখন তুমি। সেই তোমাকে ডাকতে হল, আর কিছুদিন আগে ডাকলে এতখানি হারাতে হত না।

মা, তুমি কিছুই হারাওনি। তোমার সব হারানোর বেদনার বোঝা আমিও হাল্কা করতে পারতাম না। আমার এই আসাটা তুমি চাইলেও আগে হতো না। সব কিছুর জন্য একটা নির্ধারিত সময় থাকে। সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। পাতা ঝরার দিনে ফুল ফোটাতে চাইলেই কি তা ফোটানো যায়? কুঁড়ি ধরা, ফুল ফোটা, ফল ধরা এবং পরে তা ঝরে পড়ে মাটিতে অঙ্কুরিত হওয়া জন্য একটা সময় ভাগ করা আছে। কারো কিছু চাওয়া বা ইচ্ছায় তা হয় না। তেমনি জীবনের সব কিছুই একটা নির্ধারিত সময়েই হয়। আগেও না, পরেও না। কাল শুধু সবেগে তার দিকে আকর্ষণ করে। আমরা সবাই মহাকালের রথচক্রের তলায় নিষ্পেষিত হওয়ার জন্যই নিজেকে নিবেদন করি শুধু। এজন্য আক্ষেপ এবং অনুশোচনার কিছু নেই।

পুত্র, তোমার কথাগুলো সুগন্ধ ফুলের মতো আমার নিশ্বাসে ভরে আছে। কিন্তু মানুষের মন তো, তীক্ষ্ণ ছুরির ধারের মতো আমার বুকের ভিতরটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দগদগ করে ফেলেছে। তোমাকে সব কথা না বলে স্বস্তি পাচ্ছি না।

মাগো মনকে নিয়ে জবরদস্তি করার একটা সীমা আছে। নিষ্ঠুরতারও সীমা আছে। কোন কিছুতে সীমা ছাড়াতে নেই।

চমৎকার কথা বল তুমি। তবু সব কথা গুছিয়ে বলতে আমাকে একটু সময় দাও বাবা। আমাকে তুমি বিমুখ কর না।

দ্বৈপায়ন চুপ করে সত্যবতীর দিকে অপলক চেয়ে রইল। মুখে হাসি, চোখে কপটতা।

বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভারাক্রান্ত এবং বিষণ্ণ গলায় সত্যবতী বলল : পুত্র আমার অদৃষ্টই মন্দ। বিধাতা এক হাতে দিয়ে অন্যহাতে দিয়ে আমার কাছ থেকে সব কেড়ে নিলেন। এমনটা যে কোনদিন হতে পারে স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। তবু আমার ভাগ্যে তাই ঘটল। দু'দুটো পুত্রের অকাল মৃত্যু হলো। এই মৃত্যুটা কিন্তু এভাবে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সত্যি যখন হলো নিছক ভাগ্য বলে তাকে মেনে নিয়ে তৃপ্ত হওয়ার মত কিছু পেলাম না। বরং হিসেব মেলাতে গিয়ে কেবলই মনে হয় ভীষ্ম তোমার দুই অনুজ সহোদর চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের বেঁচে থাকাটা মনে প্রাণে চায়নি। তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতাভোগের পথের কাঁটা হয়ে উঠেছিল চিত্রাঙ্গদ। তেজে, বীর্যে, সাহসে সে ভীষ্মের মতোই হয়ে উঠল। সিংহাসনে তারই দাবি। সিংহাসনে তার অভিষেক হলে মুকুটহীন রাজা ভীষ্মের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়বে। ক্ষমতা হারানোর এই আশঙ্কায় ভীষ্ম বোধহয় ভীত হয়ে পড়েছিল। তাই পথের কাঁটা চিত্রাঙ্গদকে সরিয়ে দেয়ার কথা তার মনে হয়েছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় ভীষ্ম মেতে উঠল। একটার পর একটা রাজ্য জয় করে হস্তিনাপুরের রাজ্যসীমানা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করল। চিত্রাঙ্গদের বুকে জয়ের নেশা, যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টির অভিপ্রায় সর্বদা তাকে যুদ্ধের সঙ্গী করত। ছোট ছোট রাজ্য জয়ের নেতৃত্ব দিত চিত্রাঙ্গদ। সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দুর্ধর্ষ গন্ধর্বরাজার সঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গেল। সেই যুদ্ধে নিহত হল সে। তবু প্রিয়তম ভ্রাতার মৃত্যুর কোন প্রতিশোধ নিল না ভীষ্ম। তার নীরবতা, নিষ্ক্রিয়তা আমাকে অবাক করল। ভীষ্ম জেনেশুনে তার মত কিশোরকে একা গন্ধর্বদমন করতে পাঠাল কেন? সে নিজে তার সঙ্গী হলো না কেন? ভ্রাতার মৃত্যুর জন্য তার বুকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল কই? ভীষ্মের সেই রাগ কোথায় গেল? এই প্রশ্নগুলোর কোনও সদুত্তর আজও পাইনি। কেবলই মনে হয়, এই মৃত্যুতে ভীষ্মের হাত ছিল। সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে কৌশল করে সরিয়ে দিল যেন।

মা, তোমার কথাগুলো অস্বীকার করার নয়। মনে হচ্ছে, তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়ার বশবর্তী হয়ে এসব কথা বলছ না। অনেক কিছু দেখেশুনে, বিচার বিবেচনা করে ভীষ্ম সম্পর্কে তোমার মনের অতলে যে বিপরীত স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে, এ হলো তার প্রতিভাস।

দ্বৈপায়নের সহানুভূতির স্নিগ্ধ পরশে তার হৃদয় মন ভরে গেল। সুখের অনুভূতি শাঁখের মতো বেজে যেতে লাগল তার শরীরের মধ্যে। সে ছাড়া অন্য কেউ সে

শঙ্খধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল না। সত্যবতী এক মুগ্ধ চমকে তার দিকে চেয়েছিল। তাদের দু'জনের মাঝখানে তরঙ্গহীন নিথর সময় বয়ে যেতে লাগল। দ্বৈপায়নই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল : মা, তুমি চুপ করে থাকবে? প্রেমের অমৃতকে ছাপিয়ে ভয়ের বিষে নীল হয়ে গেছে তোমার সারা শরীর। ঐ বিষটুকু শরীর থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তোমার মনের জ্বালা জুড়াবে না। কল্পনাও করতে পারবে না, কী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে।

তুমি ঠিক বলেছ। বিচিত্রবীর্যই আমার শেষ ভরসা। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। শৌর্যে বীর্যে চিত্রাঙ্গদের সমকক্ষ না হলেও পরাক্রমশালী বলা চলে। নাবালকের কাছে এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশা আমার ছিল না। ভীষ্ম চাইলেও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে তাকে দূরে রাখতাম। অভিষেকও বিলম্ব হচ্ছিল সেজন্য। হঠাৎই সংবাদ এল কাশীরাজ তিন কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ম্বরসভা ডেকেছেন। হস্তিনাপুরকে আমন্ত্রিত না করার ক্ষোভে, অপমানে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে স্বয়ম্বর সভা থেকে তিন রাজকন্যাকে বলপ্রয়োগ করে তুলে নিয়ে এল হস্তিনায়। ভীষ্ম চিরদিনই জেদী, বদমেজাজী, একরোখা। সে যা ভাবে, তাই করে। কারো কথা শোনে না! বাধা, সৎ-উপদেশ গ্রাহ্য করে না। কাশীরাজ কন্যা অম্বা ছিল বাগদত্তা। ভীষ্ম তাকে অপহরণ করার জন্য শল্যরাজ তাঁর বাগদান ফিরিয়ে নিল। অম্বা তখন ভীষ্মকে বিবাহের প্রস্তাব দিল। কিন্তু সত্যভঙ্গ হবে বলে ভীষ্ম বিয়েতে রাজি হল না। নিরুপায় অসহায় রমণী দুঃখে অপমানে আত্মাহুতি দিয়ে জীবন জুড়াল। অন্য দুই কাশীরাজ কন্যাকে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দিল। দুই সদ্যোদ্ভিন্ন তরুণী বধূর প্রেমের অক্টোপাশে বাঁধা পড়ল বিচিত্রবীর্য। তাদের নিয়ে মশগুল রইল। কামনার জোয়ারে ভেসে গেল। একটু একটু করে তার শরীর ক্ষয় হতে লাগল।কালব্যাধিতে আক্রান্ত হল। তারপর একদিন জীবনদীপ নিভে গেল। আমার ঘর আঁধার হয়ে গেল। সব হারিয়ে আমিও রিক্ত হয়ে গেলাম। ভগবান আমাকে সব দিয়েও কেড়ে নিলেন। একা থাকতে থাকতে কেবলই মনে হয় তাড়াহুড়ো করে এই বিয়ে যদি ভীষ্ম না দিত, তা হলে এই বিয়োগান্তক নাটক হত না। নিরঙ্কুশ ক্ষমতাভোগের পথ মসৃণ করার জন্য ভীষ্ম এক চতুর চক্রান্ত করেছিল। কাশীরাজের কন্যাদের স্বয়ম্বর সভায় অনাহূত হয়ে যাওয়ার সত্যি কী কোন দরকার ছিল? এতে হস্তিনাপুরের গৌরব বাড়েনি, বরং ম্লান হয়েছে। অন্যেরা ছি ছি করেছে। আমারও অবাক লেগেছে, গন্ধর্বদের হাতে চিত্রাঙ্গদের নিহত ও পরাভূত হওয়ার ঘটনা তো ভীষ্মকে হস্তিনাপুরের সম্ভ্রমরক্ষার জন্য উত্তেজিত করেনি। পরাভবের অসম্মান ভীষ্ম মুখ বুজে সহ্য করেছে। চিত্রাঙ্গদের হার থেকে জয় আদায় করার জন্য কোন অভিযান সে করেনি। কাশীরাজ

কন্যার স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রিত না হওয়ার জন্য হস্তিনাপুরের সম্মানহানি হয় কেমন করে, আজও আমার মাথায় ঢোকে না। কারণ এ রাজ্যে বিবাহযোগ্য কোন রাজপুত্র তো নেই। তাহলে, আমার মন যদি বলে, ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর অন্যতম কারণ তা হলে কি খুব অন্যায় হবে পুত্র? যতদিন যাচ্ছে ভীষ্মকে আমি সহ্য করতে পারছি না। তার সঙ্গে আমার মনের দূরত্ব বাড়ছে। আমার দুই পুত্রের মৃত্যুর জন্য সে দায়ী। মন থেকে কিছুতে এই ধারণাটা তাড়াতে পারছি না।

দ্বৈপায়ন মন দিয়ে সব শোনার পর বলল : আমাকে কী করতে হবে মা।

অত্যন্ত উত্তেজিত মস্তিষ্কে সত্যবতী তার সব হিসেব নিকেষ যেন দ্রুত সেরে ফেলল। বুকের ভেতর ভীষ্মের উপর জমে ওঠা রাগটা উগরে দিতে মনটাই নিষ্ঠুর হল। বলল, ভীষ্ম বিয়ে না করার শপথ করে নিজের ক্ষতি যত না করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করে ও আমাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। ওর ভেতর ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা লোভ, প্রতিপত্তির দুর্বার ইচ্ছে যেমন আছে তেমনি প্রকৃতি পরিবৃত হয়ে বাস করা আদিবাসীর জংলামেও আছে। ক্ষত্রিয় বাবা এবং জংলী মায়ের রক্ত বইছে ওর শরীরে। তাই ওর মধ্যে একধরনের অমানবিক হিংস্রতা আছে। ওর ব্যর্থ জীবনের জন্য আমি বোধহয় দায়ী। রাজ্যের মালিকানার ভাগাভাগি বোধহয় ওর পছন্দ নয়। তাই হয়তো সব ক্ষমতা একা ভোগ করার জন্য কৌশলে আমাকে হারিয়ে দিল। এভাবে আমি হেরে যেতে চাই না পুত্র। আমি তো একেবারে নিঃসন্তান হইনি। তুমি তো আছ।

দ্বৈপায়নের খুব অবাক লাগল। শান্ত মন খারাপ করা আর্তি তার মুখে চোখে ফুটে উঠল। বিব্রতভাবও খেলে গেল চোখের চাহনিতে। তারপর একটু হাসার চেষ্টা করল। বলল : না, এ জন্মের মতো তোমার জীবন তোমার, আমার জীবন আমার। এর কোনও পরিবর্তন না করে যদি কিছু করতে পারি, নিশ্চয়ই করব।

পুত্র নতুন করে নতুনভাবে বেঁচে ওঠার জন্য তুমি অনেক কিছু করতে পার। কৃষ্ণাঙ্গ বলে শ্বেতাঙ্গ আর্যঋষির সমাজে তোমার কোনও সমাদর ছিল না। রক্তে, বর্ণে, দর্শনে তুমি কৃষ্ণকায় অনার্যই থেকে গেছ। ওটাই তোমার একমাত্র পরিচয়। এ পরিচয় মুছে যাওয়ার নয়। তাই আর্যদের ঘৃণা বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে তোমাকে দিয়ে আর্য সাম্রাজ্যের ভিত ভাঙতে চাই। তুমি আমাকে শুধু সাহায্য কর। বিচিত্রবীর্যের দুই বধূর গর্ভে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করে তুমি এক নতুন প্রজন্মের জন্ম দাও।

এমন অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে দ্বৈপায়ন চমকাল। প্রশ্নয় ভরা বিপন্ন অসহায় গলায় বলল : মা, আমি কেন? দেবব্রত তো ছিল।

ভীষ্ম শপথ ভঙ্গ করে কোনও রমণীর সঙ্গে সহবাসে রাজি নয়। তাই, একাজ

তোমাকেই করতে হবে। তোমার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি কে আছে? পুত্র এ তোমার মায়ের আদেশ। অদৃষ্টের বিধান। মুক্তি চাইলেও তোমার মুক্তি নেই। বধূদেরও আমি সেভাবে প্রস্তুত হতে বলেছি।

দ্বৈপায়ন চুপ করে রইল। কপালে চিন্তার বলিরেখাগুলো গভীর এবং কুঞ্চিত হল। তাকে নীরব দেখে সত্যবতী পুনরায় বলল, পুত্র তোমার দ্বিধার কিছু নেই। মায়ের আদেশ পালন করছ মাত্র। কুরুবংশের কেউ নও তুমি, কিন্তু আমার পুত্র তো। মায়ের সম্পর্কে তুমিও এই পরিবারের একজন। মহাকাল বোধ হয় তোমাকে দিয়ে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে চায়। তোমার অদৃষ্টই এভাবে ডেকে আনল হস্তিনাপুরের রাজবাড়ীতে। বৎস, আমরা কেউ কিছু করি না, আমরা কেবল নিয়তি চালিত। শুধুই নিমিত্ত।

আরক্ত লজ্জায় দ্বৈপায়ন জননীর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারল না। খোলা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল। দিগন্ত অবধি নিবিড় সবুজ গাছ-গাছালির উপর পড়ন্ত সূর্যের মায়াবী আলো পড়েছে। প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছে আকাশের রঙ। সেই দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল : মা, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে। কিন্তু এটা একটা প্রকৃতিগত ব্যাপার। মানুষের চাওয়ার সঙ্গে তো পুরোপুরি মিলতে নাও পারে। ঋষিরও ক্ষমতা নেই প্রকৃতিকে লঙঘন করা। বলতে পার, তোমার মতই এক্ষেত্রে অসহায় আমি।

সত্যবতী একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পুত্রের দিকে। মুখের ভাবও তার বদলে যায়।

'দৈব সত্যবতীর সহায় হল না। অম্বিকার গর্ভে যে পুত্রসন্তানের জন্ম হয় সে জন্মান্ধ। সংবাদটা শোনা থেকে সত্যবতীর মন ভালো নেই। বিধাতা তার সঙ্গে যেন নির্মম রসিকতা করল। অথচ, অম্বিকা গর্ভবতী হওয়া থেকে কত অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্নই সে দেখত। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ছবিও আঁকা হচ্ছিল মনের অভ্যন্তরে। অম্বিকা অন্ধপুত্রের জননী হওয়ার পর নিমেষে সব কিছু ভেস্তে গেল। আশা, আকাঙ্ক্ষা সব বরবাদ হয়ে গেল। ভীষ্মের দৈব সহায়তার কাছে হার হল তার। এভাবে হেরে যেতে চায় না সত্যবতী। কিন্তু অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করে কে কবে জিতেছে? এ প্রশ্ন বিব্রত করে তাকে। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে সমস্যার কোনও সুরাহা হল না।

অন্ধপুত্রের নাম রাখা হল ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু অন্ধপুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে কী করবে? তার কাছে কোনও প্রত্যাশা থাকতে পারে না। তাকে সর্বক্ষণ অন্যের কৃপা

ও অনুগ্রহ নিয়ে বাঁচতে হয়। পরনির্ভরশীল হয়ে থাকাটা তার ভাগ্যেব লিখন। কাজেই তাকে দিয়ে রাজকার্য হবে না। রাজপুরীতে ভীষ্মই কেবল তাকে সহানুভূতির চোখে দেখে। ধৃতরাষ্ট্র তার খুব ন্যাওটা হয়েছে। তাকে নিয়ে ভীষ্মের বাড়াবাড়িটা ভালোলাগে না সত্যবতীর। বরং মনে হয় অগ্রজ বলেই সিংহাসনে তার নিয়ম মাফিক অভিষেক করে ভীষ্মই প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করবে। তার অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে সুকৌশলে ভীষ্ম আজীবন রাজক্ষমতা ভোগ করতে পারবে। মাথাটা ঝিম ঝিম করে সত্যবতীর। পুত্রহন্তা ভীষ্মকে ক্ষমতাচ্যুত করা হল না, এই ভেবে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। বুকের ভেতরটা জ্বালা করে।

আর কেউ না জানলেও সত্যবতী তো জানে নিজের কাছে হেরে যাচ্ছে সে। এভাবে হেরে যাওয়াটা ভীষণ কষ্টকর। পৃথিবীতে কেউ হারতে আসেনি। সবাই জিততে চায়। তবু ঘটনা পরম্পরায় একজনকে হেরে যেতে হয়। হারার আশঙ্কায় সব মানুষই নিজের ছায়ার সঙ্গে লড়াইর জন্য তৈরি থাকে। প্রতিমুহূর্ত নিজের আশা-আকাঙক্ষা কামনা-বাসনা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, গোপন প্রতিহিংসার সঙ্গে লড়াই করে করে ক্লান্ত হয়। এ লড়াই বাইরের কেউ দেখতে পায় না। অথচ ভিতরে ভিতরে সে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। কারণ অশান্তির বীজ তো রোপিত হয়েছে বুকের গভীরতম প্রদেশে।

মায়ের বার্তা পেয়ে দ্বৈপায়ন পুনরায় হস্তিনাপুরে এল। এবারেও সে একই কথা। পুত্র নতুন করে বেঁচে ওঠার স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু অম্বিকা অন্ধপুত্র প্রসব করে আমার স্বপ্নভঙ্গ করল। সব আমার অদৃষ্ট। পুত্র অম্বালিকাকে তুমি আহ্বান কর।

দ্বৈপায়ন আশ্চর্য হল না। তার দুই চোখের দৃষ্টিতে জীবনকে দেখার কৌতুক ও বিস্ময়। বলল : মা, অদৃষ্ট যদি এবারও হতাশ করে তোমায় তা হলে কী করবে?

সত্যবতীর অন্তরটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কিন্তু ভয় পেয়ে কাঁদতেও ভুলে গেল সে। দিশাহারার মত চেয়ে রইল তার চোখে চোখ রেখে।

অম্বালিকা যথাকালে পরমসুন্দর পুত্র প্রসব করল। কিন্তু সেও জন্ম থেকে অত্যন্ত কৃশকায়, দুর্বল এবং রুগ্ন। শরীর স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয় তার। কোন কিছুতে তার আগ্রহ, উৎসাহ নেই। সর্বক্ষণ কেমন একটা নিস্তেজ ভাবলেশহীন ভাব। বহু পরিচর্চা করেও তাকে সুস্থ রাখা মুস্কিল হল। অপুষ্টির সঙ্গে লড়াই করে কতদিন বাঁচবে এই সন্দেহে সত্যবতীর বুক তোলপাড় করে। নিজেকে প্রশ্ন করে অতঃকিম! অকস্মাৎ একটা অদ্ভুত হাসিতে তার অধর বিস্ফারিত হল। মনে হল, এ হাসি তার নয়, দৈবের। অদৃষ্ট তার অধরে হেসে উঠল যেন।

পালাবদলের ইতিহাস সৃষ্টি করতে মহাকালের পরোয়ানা নিয়ে পুত্র দ্বৈপায়ন এসেছে অতর্কিতে। সুতরাং কিছু একটা হবেই। সত্যবতী একা থাকলেই কল্পনা করে দ্বৈপায়নের রক্তবীজেই সঞ্জীবিত হয়ে আছে তার প্রত্যাশা পূরণের আকাঙক্ষা। তাই দ্বৈপায়নকে আবার আসতে হল হস্তিনাপুরে। অসংকোচে সত্যবতী বলল : পুত্র যেমনটি চেয়েছিলাম, তেমনটি হল না। বোধহয় এক পক্ষের ঘৃণায়, অনুকম্পায় অন্যপক্ষের উদাসীন স্থূল-কর্তব্যপালন একে অন্যকে পরিপূর্ণ করেনি বলেই অক্ষম, অযোগ্য রুগ্নপুত্রের জন্ম দিল বধূরা। কথাগুলো বলার পরে দ্বৈপায়নের চোখের উপর তার দীর্ঘ নিবিড় দুই আঁখি মেলে ধবল। নিজের কথাগুলোর সত্যতা বাজিয়ে নেওয়ার জন্য বলল : ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর উপর ভরসা করতে পারছি না। তুমি পুনরায় অম্বিকাকে গ্রহণ কর।

ভূত দেখার মত আঁতকে উঠেছিল দ্বৈপায়ন। বলল : অসম্ভব। তার কাছে পুনরায় অপমানকর কিংবা অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটুক তা আমি চাই না।

সত্যবতী তার আপত্তি শুনে হাসল। বলল : সন্তানের মুখ দেখে মায়েরা অনেক কিছু টের পায়। অম্বিকা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অম্বালিকা করেছে ঘৃণা। আমার জন্য সব সহ্য করেছ। তুমি না বললেও আমি জানতাম জোর করে কোনো চাওয়াই পাওয়াতে পর্যবসিত হয় না। এর দাম দিতে দুটো নিষ্পাপ শিশুর জীবন অভিশপ্ত হয়ে থাকল। এই ব্যথা বেদনা কোনোদিন ভুলব না।

দ্বৈপায়ন অসহিষ্ণু হয়ে বলল : মা আমি সন্ন্যাসী। আমাকে তুমি এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন? তোমার উদ্দেশ্য আমার মাথায় ঢুকছে না।

সত্যবতী দু'পা এগিয়ে এসে দ্বৈপায়নের গায়ে হাত রাখল। ভারী কোমল, ভারী স্নেহময় সে স্পর্শ। সত্যবতী তার হাতের মধ্যে দ্বৈপায়নের সারা শরীরের কাঁপুনি অনুভব করল। চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিতে দিতে বলল, মা হয়ে তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি। তোমার প্রতি কোন কর্তব্য করা হয়নি। নিজের সুখের দিকে ধেয়ে গেছি। আজ তাই, তোমার নিজের জন্য একটা নীড় রচনা করে দিতে চাই। অম্বিকা অম্বালিকা ওরা তোমার নীড় রচনায় সাহায্য করবে না। তাই তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তুমি অম্বিকার কক্ষে ঢুকবে।

দ্বৈপায়ন চমকে অসহায়ভাবে উচ্চারণ করল : মা।

পুত্র। লোকে দেখল তুমি অম্বিকার ঘরে গিয়েছ। কিন্তু আমি জানি সে ঘরে তার বদলে থাকবে বিচিত্রবীর্যের সুরূপা এক শূদ্রাণী মনোরঞ্জিনী। তুমি তাকেই বরণ করবে। স্বার্থহীন দানে, অজস্র সেবা, যত্ন দিয়ে সে তোমাকে ভরে দেবে। তাহলে আমার

উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে।

দ্বৈপায়ন আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। বলল : তোমার কথা আমি বুঝতে পারি না।

পুত্র আমার মন বলছে, একটা অসম্ভব কোনো ঘটনা ঘটবে। আমি শুধু তার প্রতীক্ষা করছি। শূদ্রাণী মনোরঞ্জিনীর গর্ভজাত সন্তান বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে স্বীকৃতি পাবে। তাহলেই আজীবন কুরুবংশের একজন হয়েই থাকবে সে। সব কিছুতেই তার অধিকার থাকবে। পরিবারে তার গুরুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে একাজ সম্ভব নয়।

মা, হস্তিনাপুরে আমার ঘন ঘন যাওয়া আসা নিয়ে রাজ অন্তঃপুরে কতরকমের কথা হয় জান? সবাই তোমাকে সন্দেহ করছে। আমাকে দিয়ে তুমি কিছু করতে চাও এ কথাটা আর গোপন নেই। ভীষ্মের হাত থেকে তোমার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে আমাকে কৌরব অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে এনে বসিয়েছ। সুচতুরভাবে রাজনীতির পুরভাগে আমাকে রেখে ভীষ্মকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছ। ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের ছলনা করে কার্যত তুমি এই পরিবারের একজন করে তুলছ আমাকে। আমার এই নিঃশব্দ প্রবেশকে কেউ মেনে নিতে পারছে না!

সত্যবতী অনাবিল হেসে বলল : আমি তো সত্যিই তাই চাই। তাদের ভাবাভাবি নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তুমিই হবে কুরুবংশের আগামী প্রজন্মের জন্মদাতা। এ রাজপুরীতে আমি যে একা নই, আমার পাশেও দাঁড়ানোর যে মানুষ আছে -- সেও একজন অসাধারণ বিখ্যাত মানুষ। আমার কৃষ্ণকে ভারতের সবাই চেনে। এমনকি ভীষ্মের কুরুজাঙ্গালের বাইরে রাষ্ট্রজোটের শত্রুরাজ্য পাঞ্চাল এবং যাদব রাজ্যগুলির সঙ্গেও তার গভীর সংযোগ এবং সম্পর্ক। একথাটা অন্যদের জানান দেবার জন্যই তো তোমাকে ডাকি। লোকে অন্তত জল্পনা কল্পনা করুক হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে শান্তনুনন্দন ভীষ্মের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এই শঙ্কা ভীষ্মের মনের অভ্যন্তরে যতই সংঘাতের রূপ নেবে ততই শপথের মর্যাদা রক্ষার্থে তোমার ঔরসজাত পুত্রদের হাতে সিংহাসনের অধিকার এবং রাজদণ্ড সমর্পণ করে নিঃশব্দে সরে দাঁড়াবে সে। সংঘাত ছাড়াই রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের এক দীর্ঘ অধ্যায় সমাপ্ত হবে। একটা রাজবংশকে মুছে ফেলে তার স্থলে আর এক নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিকে প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাত বদলের এক ইতিহাস তো তৈরি হবে তাতে।

দ্বৈপায়ন প্রজ্ঞা চক্ষু দিয়ে সুদূর ভবিষ্যৎকে যেন দেখতে পেল। বলল : তাতে তোমার জয় হবে ভাবছ? লড়াইর ক্ষেত্রটা তোমার কুল থেকে ক্রমেই অন্য এক কুলের দিকে প্রসারিত হয়ে এক বৃহৎ জটিল রাজনীতির সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে

ফেলবে।

সে কথা ভেবেই তোমাকে তৃতীয়বার শরণ করেছি। বিশুদ্ধ অনার্যরক্তের একজন মানুষ চাই। তোমার বীর্য, তেজ, সাধনা দিয়ে সেই প্রার্থিত মানুষটিকে জন্ম দেয়াই তোমার ব্রত। তোমার আত্মার স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রাপ্ত হবে তার মেদ মজ্জা প্রাণ।

অকস্মাৎ দ্বৈপায়নের মনে হল, সেও শূদ্রাণী মায়ের সন্তান। শূদ্রের আত্মত্যাগে ও সেবায় মানুষের সভ্যতার ইমারত গড়ে উঠেছে। সেবার শক্তিতে শূদ্রজাতি এ মহাবিশ্বকে ধারণ করে রেখেছে। অদৃশ্য দেবতা হয়তো জননীর মধ্যে দিয়ে আর এক নতুন প্রজন্মের হাতে দেশকালের ভার অর্পণ করছে। সে শুধু ঋত্বিক। চিন্তিত মুখে জননীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল : তোমার ইচ্ছাপূরণ হলে আমিও সুখী হব।

কথাটায় কিছু ছিল না। তবু কান তার গরম হয়ে গেল। কম্পিত বুকে উদ্দীপ্ত আনন্দ নিয়ে জননীর পাদপদ্ম স্পর্শ করে প্রণাম করল।

মানুষের জীবনটা নদীর মতো। একখাতে বয় না। মাঝে মাঝে খাত পাল্টায়। নদীও বোধহয় টের পায় না, কোন অদৃশ্য নিয়মে একখাত থেকে অন্য খাতে বয়ে যায়। সত্যবতীর সমস্ত মনটা তেমনি ভীষ্মের দিক থেকে অন্য এক জীবনের আধা আলো অন্ধকার প্রান্তরের দিকে নদীর চলকানো জলের মত উন্মত্ত উৎসারে ধেয়ে যায় অনাগত মুক্তির স্বাদ নিতে নিতে। ভীষ্মের কথা মনে হলেই তার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিনের ছবিটা চোখের ওপর জ্বলজ্বল করে সত্যবতীর। আর তখন খুব গভীর করে অনুভব করে দেবব্রত তার সমবয়সী হয়ে কী অবলীলায় তাকে মা বলে ডাকল। মা ডাকে কী থাকে, কে জানে? ওই ডাক কানে এলে খুশিতে ভরে যায় মন। কেন যে এমন বিপজ্জনকভাবে ভাল লেগে যায় এক একজন মেয়ের জীবনে যে, তখন সমস্ত হৃদয় জুড়ে অপত্য স্নেহ হঠাৎ ফোয়ারার মত ফিনকি দিয়ে রক্তের ধমনীতে বিপুল উল্লাসে ছড়িয়ে পড়ে। তেমন এক গভীর ভালোলাগায় সত্যবতীর দু'চোখ বুজে গেল। তাকে মা বলে ডাকার যে কেউ আছে এ সংসারে একথা ভুলে গেছিল। তাই এক মুগ্ধ চমকে, ভীষ্মের চোখে চোখ পেতে রাখল। কী সুন্দর দেখতে ভীষ্মকে? ছেলেরা এত সুন্দর হয়! বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তখন। এক গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে শুনল, সূর্যসাক্ষী রেখে দাসরাজের কাছে অঙ্গীকার করেছি, জীবনে বিবাহ করব না, হস্তিনাপুরের সিংহাসনের দাবিদার হব না।

চমকানো বিস্ময়ে সত্যবতীর বুকের অভ্যন্তর থেকে একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল। না, এত নিষ্ঠুর হয়ো না দেবব্রত। ভীষণ কঠিন প্রতিজ্ঞা তোমার। আমার সুখের জন্য

এতবড় শাস্তি নিজেকে দিও না। পৃথিবীতে অনেক ধরনের মরণ আছে। এও একধরনের মরণ। স্বেচ্ছায় নিজেকে হত্যা করে কোন স্বর্গ লাভ করবে? পুত্র, মানুষের দেয়া নেয়া করে যা অবশিষ্ট থাকে তাই শুধু নিজের। কিন্তু সেটুকুও তুমি রাখলে না। বড় বোকা তুমি। বোকারা শুধু ত্যাগ করে। নিজে ঠকে এবং বঞ্চিত হয়। এসব হয়তো তুমি জান। তোমার কাছে নতুন কথা নয়। নিজেকে এভাবে ঠকালে কেন?

ভীষ্ম মৃদু মৃদু হাসছিল। আর শান্তনু অশান্ত চিত্তবিক্ষোভে ঘন ঘন মাথা নাড়ছিল। কেমন একটা গভীর অপরাধবোধে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। সত্যিই তো নিজেকে তুমি ঠকালে কেন? পিতার কোনো কর্তব্য করিনি। মহারাজ যযাতির পুত্রের কাছে প্রত্যাশা করার অধিকার ছিল, কিন্তু তোমার কাছে আমার কোন দাবি নেই। তবু প্রার্থনা করার আগেই অযাচিতভাবে করুণা করে সকলের চোখে আমাকে ছোট করে দিলে। পুরুর ত্যাগ, মহত্ব মহারাজ যযাতিকে যেমন কাঁটার মত বিঁধত তেমনি তোমার অযাচিত এই করুণা আমাকে সুখে এবং শান্তিতে থাকতে দেবে না। যযাতিও একদিন পুত্রকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিল। তুমিও ফিরিয়ে নাও এ শপথ। নইলে, আমি শান্তি পাব না।

ভীষ্মের অধরে প্রসন্ন হাসি। বলল : পিতা, আর্য-অনার্যের মিলন বৈবাহিক সম্পর্কেই কেবল সুস্থ ও সুন্দর হতে পারে। এই দুই গোষ্টির মানুষ দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বাস করেও তারা রেষারেষি এবং বৈরিতা ভুলতে পারল না। তাই কুরুজাঙ্গালের সমস্ত মানুষকে আর্য-অনার্যের পরিচয়ে নয় এক নাগরিকত্বের, এবং মানুষের পরিচয়ে বড় করে তোলার তোমার এই মহান চেষ্টা আমার অন্তঃকরণকে হঠাৎ যদি আত্মোৎসর্গের আদর্শে বড় করে. সে কী অপরাধ আমার!

ব্যাকুল গলায় সত্যবতী বলল : ত্যাগ ছোট্ট একটা বিষয় নয়। মুখের কথাতে ত্যাগ হয় না, মনের আলোয় আভাসিত না হলে তার আলো পড়ে অন্যের মন আলোকিত করে না। যে ত্যাগে মানুষের সমাজ সংসারের কোনো কল্যাণ হয় না, তাকে ত্যাগ করা বলে না। নিজের সুখের জন্য ত্যাগকে বলে অহঙ্কার। ত্যাগে আত্মগর্ব থাকে না পুত্র।

ভীষ্ম একটুও দমল না। বিনম্র গলায় বলল : আত্মগর্ব যদি কিছু করে থাকি তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আবেগের বশে কিছু করিনি জননী। যা করেছি অনার্যদের স্বার্থরক্ষায় করেছি। পাছে একটা সুন্দর সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় তাই দাসরাজার শর্তে রাজি হয়ে গেলাম। খুব আশ্চর্য হচ্ছ তো! বিশুদ্ধ আর্যরক্তের একাধিপত্য মুছে ফেলে পিতা বর্ণসংকরের হাতে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের ভার অর্পণ করতে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু নেপথ্যে যারা সিংহাসন চালায় তারা আমাকে সুনজরে দেখে না।

তাদের হারিয়ে দেব বলে দাসরাজের শর্ত মেনে আর্য-অনার্যের মিশ্ররক্তের আগামী বংশধরকে সিংহাসনে অভিষেক করব এই অঙ্গীকার করা কি আমার খুব অন্যায় হয়েছে? পিতার সংকল্পকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য এই স্বার্থটুকু যদি ত্যাগ করতে না পারি, তাহলে পুত্র হলাম কী করতে?

কথাগুলো শুনে সত্যবতীর গর্ব হল। বুকখানা আকাশের মত বড় হয়ে গেল। তিরস্কার করেছে বলে অনুশোচনা হল। ভীষ্মের মধ্যে মিথ্যাচার ব্যাপারটা নেই, সেই প্রথম জানল। অনেককাল আগের কথা, তবু মন আলোড়িত হল। ভীষ্ম সম্পর্কে পুরনো ধ্যান-ধারণাগুলো ভীষণভাবে নাড়া খেল।

শান্তনুর মৃত্যুর পরে কার্যত ভীষ্মই রাজকার্য দেখাশোনা করছিল। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থাকতে থাকতে একধরনের নেশা ধরে গেছিল। শাসনক্ষমতা চলে গেলে কী নিয়ে বাঁচবে--এই বোধে রাজ্য ও রাজনীতিকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরল। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারটা তাই বিলম্বিত হচ্ছিল শুধু। চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর ফলে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীত্ব নিয়ে এক সঙ্কট সৃষ্টি হল। শাসনক্ষমতায় থাকার জন্য এই সঙ্কট ভীষ্মের তৈরি। এরকম একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে সত্যবতী নিজেই শুধু কষ্ট পেল না, তার অবচেতনে ভীষ্ম সম্পর্কে একধরনের বীতশ্রদ্ধা সৃষ্টি হল।

বিকেলে একা ঘরে বসে থাকতে থাকতে এসব কথা আপনা থেকে মনে আসে রোজ। কেন আসে, সত্যবতী নিজেকে প্রশ্ন করেও জানতে পারে না। তবে, মানুষকে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস করা যে ভীষণ খারাপ অসুখ, প্রাণঘাতী অসুখ—এটা দুই পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর ভীষণভাবে অনুভব করে। বুকের মধ্যে সেজন্য এক ধরনের ব্যথা বাজে অনুক্ষণ।

মনের গতিপ্রকৃতি মানুষ নিজেও জানে না। জানা থাকে না বলেই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সত্যবতীর বুকের অভ্যন্তর থেকে উঠে এল : বেচারি ভীষ্ম! নিরুচ্চারে নিজের মনে বলল। আসলে যে ভীষ্ম মা বলে ডাকে তাকে, ভীষণ শ্রদ্ধা করে, সে ভীষ্ম নয়, দেবব্রত। আর যে হস্তিনাপুরের রাজ্য চালায় সে অন্য লোক। সে হল মুকুটহীন রাজা, তার সতীনের ছেলে, শান্তনুর পুত্র। চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের বৈমাত্রেয় ভাই এবং অভিভাবক ভীষ্ম।

সত্যবতী বসেছিল বারান্দায়। সূর্যাস্ত দেখছিল। প্রতিদিনই দেখে, তবু মনে হয় এখনও কত দৃশ্য অদেখা রয়ে গেল। দেখার নেশা কিছুতে কাটতে চায় না। এক আশ্চর্য নির্লিপ্ত প্রশান্তিতে ছেয়ে থাকে সত্তা।

হঠাৎ একজন দাসী এসে বলল, ভীষ্ম এসেছেন।

সত্যবতী কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল : হাঁ, পাশের ঘরে তাকে বসতে বল, আমি আসছি।

একটু পরেই সত্যবতী ঢুকল। তাকে দেখে একটু অপ্রতিভ হাসে। মৃদুস্বরে বলল, মাকে মনে পড়েছে তাহলে!

সব সময় তোমার কথা ভাবি। অনেক রকম ভাবনা।

সত্যবতীর লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল, আমি তোমার মত অত সুন্দর করে বলতে পারি না। ভাষার ব্যবহারও জানি না।

ভীষ্মের অধরে অনির্বচনীয় হাসি। বলল, দোটানার কষ্ট তো তোমার নেই। আমার হচ্ছে শাঁখের করাত—দু'দিকেই সমান টান। কী করে বোঝাই বল, গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে নিলে ফুলের যেমন লাগে অনেকটা সেরকম হবে।

বোঝা গেল না।

বোঝানো যায় না মা। তবে, এরকম একটা দোটানা তোমারও থাকার কথা। কথাটা বলা শেষ করে ভীষ্ম স্থির দৃষ্টিতে সত্যবতীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে মৃদু একটু হেসে বলল : মা, আজ তোমার কাছে একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি। না বলে ফেরাতে পারবে না।

সত্যবতী একটু ঘাবড়ে গেল। চট করে তার মুখের ভাবটা লুকোনোর জন্য এমন একটা নাটকীয় ভঙ্গী করে হাসল, যেন কিছুই হয়নি। বলল : কী খাবে বল? ফল, না ঠাণ্ডা সরবৎ!

একথায় ভীষ্ম হঠাৎ একটু অদ্ভুত হাসল। সত্যবতী আপ্যায়িত করে তাকে যে ভুলিয়ে দিতে চাইছে, একথাটা বুঝেই বলল : ফলই দাও, ফললাভ হবে তাতে।

সত্যবতী বড় বড় চোখ করে গভীর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভীষ্মের দিকে। দাসীকে ডেকে এক থালা ফল আনতে বলল। তারপর কিছুক্ষণ থম ধরে বসে রইল চুপচাপ। দীর্ঘশ্বাস পড়ল অজান্তে। ভীষ্মের দিকে পিঠ করে বলল, আমি হঠাৎ বুঝতে পেরেছি, পৃথিবীতে রক্তের বন্ধন ছাড়া আর সব বন্ধন ভারী পলকা।

ভীষ্ম ফল চিবোতে চিবোতে বলল : একথা কেন বলছ?

সূর্যাস্তের মরা আলোর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো মনে হল বলেই বলছি।

ভীষ্ম মাথা নেড়ে বলল, তোমার এসব মনে হয় বুঝি? আসল কথা কি জান, সংসারকে যতই আপন করতে চাও না কেন, সংসার তোমাকে ফাঁকি দেবেই। এরকম করে ভাবলে দুনিয়ার সব নিয়ম উল্টে দেওয়া যায়। কিন্তু এসব হল ভাবের কথা। এর

মানে আছে কি নেই, সে তর্কে আমি যাব না। কথা বাড়িয়েও লাভ নেই। এখন কাজের কথা শোন?

সত্যবতী একটু অধৈর্যের ভাব প্রকাশ করে বলল : বল।

একটা কথা জিগ্যেস করতে খুব ইচ্ছে করে। জবাব দেবে?

তোমার কি কোনো বিশেষ অভিযোগ আছে?

আছে বলেই জিগ্যেস করছি।

ভীষ্মের চোখের সামনে সহসা কুঁকড়ে যায় সত্যবতী। তবু, সাহস করে তার চোখের উপর চোখ রাখল। বলল : না ডাকতেই এসেছ যখন, কারণ কিছু একটা আছে।

ভালোবাসা এবং ঘৃণার সম্পর্কটা কাকে বলে জান?

ভেবে দেখার দরকার হয়নি কখনো।

কিন্তু আমার হয়েছে। আহত অভিমানে তার কণ্ঠস্বর বীণার তারের মতো বেজে উঠল। মা, তোমার এবং আমার সম্পর্কটা বোধ হয় এই ভালোবাসা এবং ঘৃণার।

এসব কথা বলার মানে কি?

জানি না। কেবলই মনে হয়, যে রাজ্য-চালায়, নিন্দুকেরা মুকুটহীন সম্রাট বলে যার নামে অপবাদ দেয়, সে আমি নই। তবু অপবাদ, নিন্দে. কুৎসা নানা সন্দেহে দোষী করে আমায়। তখন বড় একা লাগে নিজেকে। তোমার কাছে কাঙালের মত দৌড়ে আসতে লজ্জা হয় না। কিন্তু যে আমি নই—সে শুধু রাজ্য জয়ের জন্য উন্মত্ত, রক্তপাত, যুদ্ধে সে একটুও ভয় পায় না। সে কখনও আমার মত তোমার স্নেহের টানে দৌড়ে আসে না। সব মানুষ একটা কিছু নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। যার কোন অবলম্বন নেই, আশ্রয় নেই, পায়ের তলায় মাটি নেই, সে মানুষটা নেশায় ডুবে থাকে। নেশা করে ভুলে থাকে। নেশা তার শূন্যস্থানটা ভরে রাখে। একে দোষ বলবে কেউ? আমার আমিময় জীবনে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তুমি যে আছ কাজের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়নি। বৃহত্তর এক জীবন আমাকে আহ্বান করে। তারপর সব কাজ শেষ হয়ে গেলে নিজেকে বড় একা মনে হয়। তখনই অনুভব করি আমি নিজেকে যা ভাবি, আমি তা নই। অথচ, আমার সমস্ত সত্তা যেন বিশ্বব্যাপী আকাশ পাতাল জুড়ে মুখব্যাদান করে আছে। এর সঙ্গে আমার লোভ কিংবা উচ্চাকাঙ্খার কোনও সম্পর্ক নেই। আমার শূন্যতাবোধকে ভরে রাখার এক উপচানো আনন্দ এবং জয়ের এক অসহনীয় সুখবোধ এ কেবল আমার একার। এর ভাগ আর কাউকে দেয়া যায় না। আমার এই স্বভাব

এবং প্রকৃতির জন্য বাইরের নানা সমস্যার জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তোমার কাছেও বোধহয় আমি সেইরকম এক মানুষ হয়ে উঠেছি। নইলে, আমার মনের অভ্যন্তরে সর্বদা কেন প্রদোষের রহস্যময় আলো আঁধারের মত বিপন্ন এক অসহায়তা, সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস আমার সমস্ত সত্তাকে আক্রমণ করে যেন ছিন্নভিন্ন করে দেয়। মনে হচ্ছে, এক দেবব্রত ভেঙে তিনখানা হয়েছে। দ্বৈপায়নের হস্তিনাপুরের আগমনের পূর্বে আমার যে জীবন ছিল তা প্রথম খণ্ডমাত্র। দ্বৈপায়নের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্মের পরে আমি দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করেছি তোমার মনের অভ্যন্তরে। দেবব্রত মরে ভীষ্ম হয়ে গেছে। আগামী উত্তরাধিকারীরা এক নতুন জীবনের সূচনা করবে। জানি না, কেমন হবে ওই তৃতীয় খণ্ডের জীবন যাপন? বড় ভয়ে আছি। এখনও আমার জন্য একটু স্নেহ আছে তোমার অন্তরে। ভালবাসার সেই পাত্রটুকু শূন্য হওয়ার আগে আমাকে মুক্তি দাও।

সত্যবতী নিরুত্তর। ভীষ্মের দিক থেকে আকাশের দিকে চোখ ফেরাতে দেখতে পেল এক অতিকায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘস্তূপ। এক অদৃশ্য পালোয়ানের মত চেহারা নিয়েছে। আকাশের সূর্যাস্তের সব আলোটুকু মুছে গেছে। সন্ধ্যের কুয়াশামাখা অন্ধকারের কৃষ্ণবর্ণ মেঘস্তূপ দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে গোটা আকাশটাকে ভয় দেখাচ্ছে। সত্যবতীর বুকের ভেতরটা আশঙ্কায় তোলপাড় করে উঠল। মনে হল, শীঘ্রই একটা কিছু হবে। এই রহস্যময় আশঙ্কা এবং উদ্বেগের উৎস কোথায়? অনেক আকাশ পাতাল ভাবনা কয়েক মুহূর্ত তার মন জুড়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল তার ভেতরটা। মাথার ভেতর একটা অদ্ভুত বোবা ভাব। সব ভাবনা চিন্তা থেমে গেছে। কথা বেরোচ্ছে না। বার দুই ঢোঁক গিলল। একটা আবেগ তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। ভীষণ অনুশোচনা হচ্ছে। কান্না পাচ্ছে। ঘুরে দাঁড়াল সত্যবতী। ভীষ্মের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না। ভীষ্ম কে? মানুষ, না দেবতা? কিংবা কোনো কুশলী অভিনেতা? শরীরটা দুলছে সত্যবতীর। মাথাটা হঠাৎ শূন্য লাগছে। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইল। কিন্তু হাঁটুতে জোর পেল না। বুকের মধ্যে একটা অশান্ত অস্থিরতা।

॥ দুই ॥

দ্বৈপায়নের ঔরসজাত পুত্র ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর তিনজনকেই বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজপুত্র বলা হল। বয়সেই তারা ছোট বড় শুধু। নইলে, তাদের ভেতর আর কোনও তফাৎ নেই। শূদ্রাণী পুত্র বলে বিদুরকে সত্যবতী আলাদা করে দূরে সরিয়ে রাখতে দেয়নি। এ পরিবারের অম্বিকা, অম্বালিকাপুত্রের মতো তারও সব বিষয়ে সমান

অধিকার এবং সমান মর্যাদা। সেও কুরুবংশের সন্তান। সত্যবতী অনেক ভেবেচিন্তে বিদুরকে এই পরিবারভুক্ত করে রেখেছে। ভবিষ্যতে তাকে নিয়ে কোনো সমস্যা হয় তার পথ খোলা রাখেনি।

বিদুরের প্রতি সত্যবতীর স্নেহ যে একটু বেশি। তার কোন রাখঢাক নেই। কৌরব পরিবারের অনেকের বিশ্বাস এই সন্তানটির জন্মের জন্য সত্যবতীর নিজের কাছে অনেক দোষ জমা হয়ে আছে। সাধ্যমত চেষ্টা করেছে সেগুলো স্খালন করতে। মানুষ যখন কোন অন্যায় করে তখন স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি থেকে সে পতিত হয়ে যায়। সেই পতিত মনটাকে স্বস্থানে পুনঃস্থাপন করার নামই প্রায়শ্চিত্ত। সত্যবতী নিজের বিবেকের কাছে সে ধরনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছে। কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। জল ঘোলাও করেনি। কার্যত বিনা বাধায় বিদুর এই পরিবারের অভ্যন্তরে মর্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত হল। সত্যবতী খুব ধীরে সুস্থে বিদুরকে কুরুবংশের একজন করে তোলার এক পরিবেশ সৃষ্টি করল।

বিদুরের ওপর সত্যবতীর দৃষ্টি ছিল সজাগ। সর্বক্ষণ তাকে চোখে চোখে রাখে। রাজনৈতিকভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত না করা অবধি শান্তি ছিল না তার। রোজ তাকে চোখে দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা কতখানি, একদিন দেখতে না পেলেই অন্তরে সে টের পায়। বিদুর তার মার কাছে আদরে আছে, ভালো আছে, ভাইদের সঙ্গে মিলে মিশে জমজমাট হয়ে আছে, এসব জেনেও সে উদ্বিগ্ন হয়। সত্যবতী জানে, বিদুর ভাল আছে, ভাল না থাকার কথা নয়। তবু সামনে পেলে একবার জিগ্যেস করবে কেমন আছে? সে বলবে ভাল। তখন সত্যবতী তার সুডৌল মুখের রেখাগুলি, চোখের দৃষ্টি পরখ করবে। তার যদি মনে হয় ভাল, তাহলেই ভাল। আর যদি মনে হয় ভালো নয় তা হলে মৃদু ভর্ৎসনা করে বলবে, আমি বুঝি তোর পর? আমাকে লুকোচ্ছো কেন? বিদুর বড় হয়েছে। এসব প্রশ্ন হলে সলজ্জ হাসে, শুধু ঠাকমার চোখে চোখ রেখে। সত্যবতী তখন চোখ গোল গোল করে বলবে-ওঃ আবার হাসা হচ্ছে! দুষ্টু ছেলে।

বিদুরও তার কোল ঘেঁসে বসে বললে— তুমি ভীষণ ছেলেমানুষ।

সত্যবতী বলল, হাঁরে, তোকে নিয়ে আমার ভয়ের অন্ত নেই। খুব সাবধানে থাকি। কে কি বলল তার পরোয়া করি না। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন কিছু হবে না, তারপরের কথা কিছু জানি না। সব তোর ভবিতব্য। তবে এ বাড়িতে তোর আর তোর মার গায়ে কেউ আঁচড় দিতে পারবে না।

সত্যবতীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে বিদুর সমস্ত হাল্কা করে দিয়ে বলে ; ঠাকমা, আমি তো বড় হয়ে গেছি। এই পরিবারের সকলে আমাকে ভীষণ ভালবাসে। সকলের সঙ্গে

আমার একটা সুন্দর বোঝাপড়া আছে। সব অবস্থার সঙ্গে আমি অদ্ভুত মানিয়ে নিতে পারি। আমার কথা ভেবে নিজেকে তুমি কষ্ট দাও কেন? তোমার কিসে কষ্ট আমাকে খুলে বল।

বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল সত্যবতীর। বলল : সব বলব। সময় হলেই সব জানতে পারবে।

সত্যবতী হঠাৎ ভারি গভীর এবং মায়াবী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বিদুরের দিকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক দুরন্ত ভালোলাগার বিদ্যুৎ খেলে যেতে লাগল। থরথর করে কাঁপছিল তার অভ্যন্তরটা। মাথার ভেতরটা পাক খেতে লাগল। দুরন্ত শোক থেকে উৎপন্ন ক্রোধে সত্যবতীর মুখখানা গনগন করতে লাগল। নিরুচ্চারে মনে মনে বলল : ভীষ্মের কাছ থেকে ধৃতরাষ্ট্রকে কেড়ে আনতে হবে। তার পুরুষোত্তম ভাবমূর্তি লোকের অন্তরে তাকে অনেক বড় করে তুলেছে। সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে সে। এই লোকটাকে বিগ্রহের আসন থেকে টেনে ধুলোমাটির মধ্যে নামাতে চাই। যে উচ্চকাঙক্ষার নেশায় মানুষটা চিরকাল কাছের লোকজনকে অবহেলা করেছে, তাদের সুখ, দুঃখ, মনোবেদনার দিকে তাকায়নি, শুধু নিজের জেদে অটল থেকে স্বার্থপরের মতো নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, তার সব কিছু মুছে ফেলে না দেয়া পর্যন্ত সত্যবতীর শান্তি নেই। শুধু তার ভুল সিদ্ধান্তের জন্য চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হল। তাদের মৃত্যুটা যতদিন মনে থাকবে ভীষ্মের ভুল সিদ্ধান্তকে এবং তার আপোষহীন জেদী স্বভাবটাকে ভুলতে পারবে না। ভীষ্মকে শোধরানোর জন্য তাকে রাজনীতি এবং রাজ্যশাসন থেকে দূরে রাখা একান্ত দরকার।

বিদুর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে তার ভাবান্তর লক্ষ্য করল। খুবই বুদ্ধিমান এবং শান্ত মেজাজের ছেলে বিদুর। সত্যবতীর অন্তরের অভ্যন্তরে যে একটা বিরাট ভাঙা গড়া চলছে সে তার অনুভূতি দিয়ে বুঝল। কিন্তু বাইরে তার মনের প্রতিক্রিয়া কিছুমাত্র প্রকাশ করল না। বিদুরও কোন প্রশ্ন করে তাকে উত্যক্ত করল না। নিঃশব্দে উঠে গেল সে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে অপলক চোখে নীরবে বিদুর তার ভাবান্তরের দৃশ্যটা খানিকক্ষণ দেখল। আশ্চর্য লাগল। কত দূরের মানুষ যেন সত্যবতী। তবু স্নেহ মমতার চৌম্বক আকর্ষণ সত্যবতীর দিকে তাকে টানতে লাগল। সে জানে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা বৃথা। মাঝখানে অসংখ্য অদৃশ্য বাধা।

ভরা দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। নীল আকাশে মেঘের ছিটে ফোঁটা নেই। সবটাই নীল। সূর্যের কড়া রোদের তাপে সতেজ সবল গাছগুলো পর্যন্ত নেতিয়ে পড়েছে।

যতদূর চোখ যায় সমস্ত স্থানটাই নির্জন এবং রোদে ঝলমল। ঘুঘুর ডাকে এক অদ্ভুত শূন্যতা সৃষ্টি হয়। ছাদের কার্নিসের ছায়ায় পায়রার সপ্রেম গদগদ স্বর এক মায়া রচনা করে। ওদের জীবনে কোনো সমস্যা নেই। তাই এক উপচানো আনন্দে, অসহনীয় সুখবোধে সর্বক্ষণ মুখর।

এইসব ঘটনা ও দৃশ্য এবং শব্দের মায়া মোহের অনির্বচনীয় আকর্ষণ সত্যবতীকে মোহাবিষ্ট করে। একা একা এসব অনুভব করতে ভীষণ ভালো লাগে। এই আলো, ছায়া, অর্থহীন শব্দ মনোহরণের দৃশ্য মৃত্যুর পরেও কী এমন গভীর করে পৌঁছবে তার কাছে? মৃত্যু মানেই স্বপ্নহীন, মায়াহীন, অনস্তিত্বের অন্তহীন ঘুম। আর তখনই মনটা খারাপ হয়ে যায়। নিজের অজান্তে চলে আসে বিদুরের মহলে। এমনিতে খুব একটা বিদুরের ঘরে আসে না। ইদানীং তার যাওয়া আসাটা বিদুরের ঘরে বেড়েছে।

ঠিক দুপুরে সত্যবতীকে তার ঘরে হাজির দেখে বিদুর বেশ অবাক হলো। বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে সত্যবতীর দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। সত্যবতীর চোখ দুটি হরিণের মতো আশ্চর্য সুন্দর। নীল সাগরের গভীরতা। কী গভীর মায়া আর কত করুণ সে মুখখানি। সরল চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে বিদুর বলল, ঠাকমা, তোমাকে খুব বিচলিত মনে হচ্ছে। তোমার হয়েছে কী?

সত্যবতী কী বলবে ভেবে পেল না। অনেকদিন ধরে কথাটা বলি বলি করেও বলা হয়নি। আজ সমস্ত মনটা সে তৈরি করে এসেছিল। বলল : হয়নি কিছু। তবে, মনটা ভালো নেই।

মনের কষ্টের কথা জানতে চাওয়া যদি দোষ না হয়, তাহলে আমাকে বলে মনের ভার হাল্কা করতে পার।

সত্যবতী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। বলল · তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে।

বিদুর বলল : সে আমি জানি। অনেকদিন ধরে কিছু একটা বলার ভূমিকা করছ। কিন্তু মুখ খুলতে পারছ না। সহস্র দ্বিধায় তোমার কথাগুলো গলার কাছে আটকে রয়েছে। দাসিপুত্র বলেই হয়তো সংকোচে বলতে পারছ না। চোখের ভাষায় তোমার মনে কথাটা বুঝতে চেষ্টা করতাম।

বিদুরের কথাগুলো সত্যবতীর হৃদয়টাকে দ্রব করে দিল। বলল : বিদুর তোমার কাছে আমার অনেক দাবি। এখন লুকোনোর কিছু নেই। অনাবৃত করে দেখানোর এবং বলার সেই সময় হয়েছে। তুমি লেখা পড়া শিখেছ। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান হয়েছে তোমার। এ পরিবারের অনেক কিছু জান, আবার জান না। যেটুকু জান তাও অসম্পূর্ণ। বর্তমানে

সংকটের মধ্যে দিন কাটছে। কেবল তুমিই পার সংকটে আমার পাশে দাঁড়াতে।

বিদুরের অবাক হওয়ার পালা। সত্যবতীর জীবনে কত ঝড়-ঝাপ্টা গেছে, তবু তাকে ভেঙে পড়তে দেখেনি। আজ সেই চিরচেনা মানুষটি এত উতলা কেন? সত্যবতীর কী হয়েছে? নিজেকে তার এত বিপন্ন, অসহায় মনে হচ্ছে কেন? এক গভীর সহানুভূতিতে তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ কাঁপছিল, ঝড়ের মুখে অসহায় পাতার মত। আস্তে আস্তে বলল, ঠাকমা, আমি শূদ্রাণী পুত্র। এই পরিবারের কেউ নই। তবু তোমার সঙ্গে এক অপলকা বন্ধন রয়ে গেছে। তোমার দয়ায়, প্রশ্রয়ে ভালোবাসায় এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছি। তুমি আমার আশ্রয়, আমার অবলম্বন। সংকটের দিনে তোমার পাশে দাঁড়ানো আমার ভাগ্যের কথা। কিন্তু যারা তোমাকে ঘিরে আছে, তারা মেনে নেবে কি? অন্ত্যজ বলে কেউ আমায় দূরে সরিয়ে রাখেনি, কিন্তু কাছেও টেনে নেয়নি। পরগাছার মত নিজের জোরে আঁকড়ে আছি। বিনিসূতোর মালায় গাঁথা এক অপলকা অধিকারের বন্ধন। যে কোন মুহূর্তে খসে যেতে পারে।

বিদুরের কথাগুলো সত্যবতী মন দিয়ে শুনল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল। নিজের সব ভাবনার কথা অন্যকে বলতে নেই। তবু কিছু কিছু কুসুমগন্ধী কথা থাকে যা বিশ্বাসভাজনের কাছে ঠিক সময়ে পৌঁছে না দিলে তার কোনো গন্তব্যই থাকে না। নিজেকে তেমনভাবে প্রকাশ করতে শুধু ভাষা নয়, পরিবেশ সৃষ্টির দরকার হয়। সত্যবতীর মনে হলো, সেরকম একটা অনুকূল ভাবাবেগে বিদুরকে সে উৎকর্ণ করতে পেরেছে। তার বুকের ধুকপুক শব্দ নিজের বুকের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে একছন্দে মিশল। বিদুরকে হাত ধরে পালঙ্কে বসাল। নিজেও বসল তার মুখোমুখি। আস্তে আস্তে বলল, বৎস, শূদ্রের অভিমান, লজ্জা, আত্মগ্লানি তোমার মতো আমিও বুক বয়ে বেড়াই। সেই কথাটা বলতে এসেছি তোমাকে। অনেককাল আগের কথা। তবু মাঝে মাঝে ভীষণ মনে পড়ে। একটা ভয়ঙ্কর রাগে ভেতরটা প্রতিশোধস্পৃহায় নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। আমার সমৃদ্ধ জীবন যারা ব্যর্থ করে দিল তাদের ক্ষমা করতে পারি না। সমস্ত মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অথচ, সে কথা কাউকে বলতে পারি না। বুকের মধ্যে একা বহন করি। তুমি পার না আমায় সাহায্য করতে।

বিদুরের সারা বুক জুড়ে শিহরণ বয়ে গেল। হীনমন্যতার এক গভীর যন্ত্রণায়, অবহেলার অপমানে তার বুকের ভেতরটা টাটাতে লাগল। সত্যবতী, হয়তো ভালো করেই জানে শূদ্রের অভিমানে সে সংকটে তার পাশে দাঁড়াবে, কোন অবস্থাতে ত্যাগ করবে না। বৃদ্ধ বয়সে তার জীবনে একান্ত নিশ্চিন্ত আশ্রয় সে। এতবড় বিশ্বাস এবং প্রত্যয় নিয়ে যে মানুষটা আজ তাকে আশ্রয় করেছে তাকে 'না' বলে ফেরাতে মন চায়

না বিদুরের। আবার তার মহানুভবতার পরম দান গ্রহণের মতো মনের অবস্থাও তার নেই। অস্থিরতায় বারকয়েক মাথা নাড়ল। বলল, তোমার জন্য আমি সব পারি। বিষের যে জ্বালায় তোমার বুক অহরহ জ্বলছে, সেই জ্বালা অহর্নিশ আমার বুকেও। মনোরঞ্জিনীর পুত্র বলেই যোগ্যতা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোনকালে হস্তিনাপুরের রাজা হতে পারি না আমি।

বিদুরের সেই গহন বিষণ্ণতার মধ্যে সত্যিকারের একটু আনন্দ দেবার জন্য সত্যবতী বলল, মনে মনে আমি ভীষণভাবে চাই তুমি হস্তিনাপুরের রাজা হও।

তোমার চাওয়া যে সব নয়, আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তবু চাওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

সত্যবতী চুপ করে রইল। দুপুরের ফুর ফুরে হাওয়ায় তার মাথার চুল এলোমেলো উড়ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা শ্বাস পড়ল। হতাশ গলায় বিমর্ষস্বরে বলল, কৃষ্ণবর্ণা অনার্য রমণীদের আর্যরা কোনোদিন সম্মান কিংবা শ্রদ্ধা করিনি। তাদের খুব সস্তা আর সহজপ্রাপ্য মনে করে। তারা শুধু আর্যপুত্রদের লালসা চরিতার্থ করার যন্ত্র। কৃষ্ণবর্ণ আদিম অধিবাসীরা একধরনের হীনমন্যতায় ভোগে। শ্বেতাঙ্গদের কাছে তারা কেমন সংকুচিত হয়ে পড়ে। নিজেদের খুব দীন মনে করে। শ্বেতাঙ্গদের একটু করুণা পেলেই তারা ধন্য হয়ে যায়। তাদের সান্নিধ্যে মনটা ভরে যায়। সেবার অধিকার পেলেই কৃতার্থ হয়। এ ধরনের মানসিকতার মধ্যে একটা দাস্যভাব আছে। শ্বেতাঙ্গদের প্রতি কালো মানুষদের এই দুর্বলতা তাদের সব দুর্ভাগ্যের হেতু। কিন্তু পিতা দাসরাজ সুকৌশলে আমার দুর্ভাগ্যের কপালে জয়টীকা পরিয়ে দিলেন। একজন দুর্বলও কৌশলে দুর্ভাগ্য থেকে জয় আদায় করে নিতে পারে, এই সহজ কথাটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমি তোমাকে এবং দ্বৈপায়নকে তার অস্ত্র করেই এদের বিরুদ্ধে লড়ব।

বিদুরের ভেতরটা সহসা চমকে উঠল। থরথর করে কেঁপে উঠল তার সর্বশরীর। সত্যবতীর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপরে কি মনে করে চোখ বুজল। বলল, ঠাকমা, এ তোমার সংসার, তোমার রাজ্য। তুমি এ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। সর্বময়ী কর্ত্রী। কার সঙ্গে তোমার ঝগড়া?

আমার সব ঝগড়া শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে। তাদের গড়া সাম্রাজ্যের শক্ত ভিতের উপর আমি কালো মানুষদের জন্য একটা আলাদা রাজ্য গড়ে যেতে চাই। কালো মানুষদের অভিশপ্ত জীবনের অবসান কামনা ছাড়া আমার কোনো বাসনা নেই। ঈশ্বরেরও বোধ হয় সেই ইচ্ছা। নইলে, আমার জীবনটা এমন ঘটনাবহুল হবে কেন? বাধা ছকের

বাইরে অকস্মাৎ এ কোন জীবনধারা এসে মিশল? সেই ধারায় গা ভাসিয়ে আমিও বাসনার উপকূলে পৌঁছে গেলাম। এখনও অনেক দূর। শুধু তটভূমি দেখা যাচ্ছে।

বিদুর উৎকর্ণ হয়ে সত্যবতীর কথাগুলো শুনছিল। বুকের ভেতর ঝটিতি অজস্র প্রশ্ন একসঙ্গে উথাল পাথাল করে উঠল। কিন্তু একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারল না। বরং আশ্চর্য লাগল এই ভেবে, যার জীবন নানা দিক থেকে এত কানায় কানায় পূর্ণ তার তো কোন ক্ষোভ দুঃখ থাকার কথা নয়। তবু তার ভেতরটা কত রিক্ত! কত একা সে! কেন এমন হয়? প্রশ্ন প্রশ্ন -- কত প্রশ্ন তার মনে এল। মানুষের জীবনে কত ঘটনাই ঘটে— যার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু এইসব ঘটনা অজান্তে তাকে এক অন্যমানুষ করে দেয়। হয়তো সে নিজেও জানে না। সে শুধু আরম্ভটা দেখতে পায়, শেষ কোথায় জানে না? তবু প্রত্যাশা নিয়ে পথ চলে। গন্তব্য জানা না থাকলে একজন সফল মানুষও ব্যর্থ হয়।

কয়েকটা মুহূর্ত উভয়ের চুপ করে কাটল। বিদুরের ধ্যানস্থ দু'চোখের গভীরে কী দেখল সেই জানে। পালঙ্ক থেকে নেমে জানলার ধারে দাঁড়াল। খোলা জানলা দিয়ে নীল আকাশের অনেকখানি দেখা যায়। রৌদ্র করোজ্জ্বল, নির্মেঘ আকাশের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে সত্যবতী বলল, তুমি তো ঈশ্বর বিশ্বাসী ছেলে। ঈশ্বর যেভাবে চালান সেভাবেই চলি। আমরা কেউ কিছু করি না। একটার পর একটা ঘটনা এমনভাবে ঘটছে আমার জীবনে যে, প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে ঈশ্বরই আমাকে দিয়ে কিছু করাচ্ছেন। তা না হলে আমার সাধারণ জীবন এমন অসাধারণ ঘটনাবহুল হবে কেন? কত বিচিত্র ঘটনায় ভরা আমার জীবন। আমার সারা জীবনের মধ্যে ধীরে ধীরে অদৃশ্য কালিতে, অব্যক্ত ভাষায় লেখা হচ্ছে এক বদলের ইতিহাস। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক থেকে ধাক্কা খায় যখন বুঝতে পারি ভিতটা অলক্ষ্যে তৈরি হয়ে গেছে। পালাবদলের কাজটাই শুধু বাকি। দ্বৈপায়ন সোনার চাবি হয়ে সেই অজ্ঞাত গুহার অন্ধকার ঘরের দরজাটা খুলে দিয়েছে। মহাবল মহাকাল গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছেন পদদলিত শূদ্রের তেজে জেগে উঠতে। জান পৌত্র, আমি মহাকালের সে পদধ্বনি কান ভরে শুনতে পাই। আমার হৃদয়ছন্দে নটরাজ ডমরুধ্বনি করে নাচছেন। তাঁর এক পা অতীতে, এক পা বর্তমানে। হাসি কান্নার তরঙ্গে দুলছে আমার বুকের হার। বুকের হাড় গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, তবু একবারও বলতে ইচ্ছে করছে না, হে নটরাজ, থামাও তোমার নৃত্য। তুমি দারুব্রহ্ম হয়ে যাও। অথবা তুমি বামনরূপে এসে তৃতীয় পা আমার মাথার ওপর রাখ। তোমার পদতলে পিষ্ট করে দলিতদের জিতিয়ে দাও। অবহেলা, অনাদর, অসম্মান, বঞ্চনা, যন্ত্রণার ভার আর কতকাল বহন করবে তারা? দলিত মানুষের অভ্যুত্থানের শক্তি

বিধাতা দিয়েছে তোমায়। তুমি চাইলেই পার, প্রতিদিনের লজ্জা, অপমান, আত্মগ্লানি থেকে শূদ্রদের রক্ষা করতে এবং জীবনযুদ্ধে তাদের জিতিয়ে দিতে। কেবল সেই ইচ্ছেটুকু তোমার ভেতর জাগাতে হবে।

বিদুরের সব কথা হারিয়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল সত্যবতীর দিকে। ঠাকমাকে তার ভীষণ অচেনা মনে হলো। আশ্চর্য লাগে। একবুক রাগ, অপমান, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো গনগন করছে তার ভিতরে। মুখেচোখে বিহ্বলভাব। হঠাৎ এরকম একটা রূপান্তর বিদুরকে বিপন্ন করে। ঝড়ের মুখে অসহায় পাতার মতো কাঁপছে তার ভেতরটা। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না, সে যা শুনল তা স্বপ্ন, কল্পনা, না বাস্তব! কিন্তু একজন মানুষ এভাবে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কী করে? এ রাজ্যের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়েও সত্যবতী দলিতদের প্রতি গোপন সহানুভূতিকে দয়া কিংবা করুণায় নোংরা করেনি। কারণ অধিকার ভিক্ষা করে পাওয়ার জিনিস নয়। অনেক মূল্য দিয়ে তা অর্জন করতে হয়। যে নিজেকে নিজে রক্ষা করতে শেখেনি বাইরের কোনো শক্তি কিংবা অনুগ্রহ তাকে রক্ষা করতে পারে না। তাকে অবশ্যই আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। এ পৃথিবীতে বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া না। সত্যবতী হয়তো তাকে বাজিয়ে দেখার জন্যই কথাগুলো বলেছে। কিন্তু তাতে কতখানি অবিশ্বাস, কতখানি সন্দেহ এবং ছলনা ছিল বিদুর পরিমাপ করতে পারল না। কেবল কথা বলার সময় সাবধান হলো। মৃদু কণ্ঠে বলল, ঠাকমা, মনোরঞ্জিনীর পুত্র আমি। যে কোনো বিষয় মনস্থির করতে আমার সময় লাগে। আসল কথাটা হলো, এই পৃথিবীতে আমরা পরস্পরের কতটা আপনজন?

ভীষণ চমকে উঠেছিল সত্যবতী। শীত বাতাসের একটা চাবুক তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। কষ্টে বলল : আমার, তোমার এবং দ্বৈপায়নের জন্ম শূদ্রাণী মায়ের গর্ভে। আমাদের দুঃখ, যন্ত্রণা এক। আমরা কেউ আলাদা নই। অনার্য রক্তের অনেক কিছু আমাদের মনের গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছে। তাকে সহজে উপড়ানো যাবে না। বোধ হয় পুরুবংশের অভ্যন্তরে বীজটা পুঁতেছিল উপচির বসু, অনেককাল আগে।

বিদুরের মুখে বিহ্বলভাব। কেমন একটা রূপান্তর ঘটে যায়। তার সুরুচি ও সূক্ষ্ম অনুভূতিময় জীবনে সহসা অদৃষ্ট যেন দৈত্যের বেশে মসীলেপন করতে লেগেছে। আর অসহায়ের মত তাকে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে তার কাছে। গঙ্গাপুত্র ভীষ্মও অনার্য রমণীর সন্তান। তা হলে ঠাকুরমার সঙ্গে তাঁর বিরোধ কেন? তাকে সহ্য করতে পারছে না কেন? সে কি শুধু সপত্নীগত পুত্র বলে, না অন্য কিছু। নিজের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করতে লাগল বিদুর। বলল : তোমার জন্য কিছু করতে পারলে আমার নিজেরই

ভাল লাগবে।

সত্যবতী বিদুরের কথায় একটু অবাক হয়। বলল : আমার জন্য তো কিছু করতে বলিনি। শুধু বলেছি দলিতদের একজন হয়ে এই বাড়ির বনিয়াদ ভাঙতে থাক। দলিতদের বুকের আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাক।

বিদুর নিঝুম চোখে সত্যবতীর দিকে তাকিয়ে বলল . তুমি না চাইলেও এই বংশ ছারখার হয়ে যাবে। অনেক কলুষিত রক্ত ঢুকেছে এ পরিবারে।

সত্যবতী মাথা নাড়ল। বিদুর মৃদুকণ্ঠে বলল : এসব কথা কেউ মুখ ফুটে বলে না ঠাকমা। মনের কথা প্রকাশ করতে নেই। তাতে বাতাসে সন্দেহের বীজ ছড়িয়ে যায়। আর বাতাসেই সব বার্তা সবাই জানতে পেরে যায়।

সত্যবতী জ্বালাভরা দৃষ্টিতে বিদুরের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : জানি। এই বয়সে তুমি কত বিচক্ষণ। সবদিকে তোমার নজর। যতদিন যাচ্ছে ততই তোমাকে ঘিরে আমার স্বপ্ন, বাসনা, আকাঙক্ষাগুলো মুকুলিত হচ্ছে। আমার কল্পনা বাস্তব হয়ে যাচ্ছে। আমার ভেতর লুকোনো ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা একটা রূপ পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি হেরে যাইনি। ফুরিয়েও যাইনি। বিজয়কেতন নিয়ে মিছিলের পুরোভাগে তুমি চলেছ।

ঠাকমা, তুমি চুপ কর। এসব কথা বলতে নেই।

বাধা দিস না। আমাকে বলতে দে। বুড়ো হয়েছি, কবে আছি, কবে নেই তার আগে স্বপ্নের স্থপতিকে সব কথা বলে আমি খালি হয়ে যেতে চাই। পৌত্র, বুকের ভেতর জমানো অভিমান বাধা মানছে না। সব নিষেধ, প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে তার। আমিও আড়াল রাখতে চাই না আর। তোমার সব জানা দরকার। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, যোগ্যতা, ক্ষমতার কোনো অভাব রাখেনি বিধাতা। অন্ধত্বের জন্য পরনির্ভরশীল থাকতে হবে চিরকাল। চোখ খোলা রেখে তার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয় বলেই ইচ্ছেয় অনিচ্ছেয় তাকে কোনো সুচতুর বুদ্ধিমান ব্যক্তির সাহায্য নিতে হবে। সেই ব্যক্তিটিই ধৃতরাষ্ট্রকে পুতুল করে রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে বসবে। আমি চাই না, দেবব্রত পুনর্বার ক্ষমতায় ফিরে আসুক।

ঠাকমা, আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

দেবব্রতকে একদিন আমি বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু তার কাছে ঠকে গেছি। এক অসাধারণ প্রতিজ্ঞায় সে আমায় যেমন মুগ্ধ করেছে, আচ্ছন্ন করেছে, তেমনি বোকাও বানিয়েছে। হয়তো আমার অদৃষ্টও সেজন্য দায়ী কিছুটা। তবু মানুষের মন তো। ভবিতব্যের অনেকখানিতে মানুষের হাত সে দেখতে পায়। চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের

অকাল মৃত্যুর জন্য দেবব্রতকে কোনোদিন আমি ক্ষমা করতে পারব না। হয়তো সে নিমিত্ত। তবু, তাদের মৃত্যুর জন্য দেবব্রতেরই নিরঙ্কুশ ক্ষমতাভোগের দুর্মর লোভই দায়ী। দেবব্রত আমার সাধের স্বপ্ন ভেঙে খানখান করেছে।

বিদূর অস্বস্তিবোধ করে। প্রসঙ্গটা খুবই লজ্জাজনক। এই ধরনের কথায় দেবব্রতের মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তির মর্যাদাহানি হয়। তাই এক দারুণ প্রতিবাদে সে মাথা নাড়ে। বলল : ঠাকমা, তোমার মনটা আজ ভালো নেই। নানাবিধ কারণে তোমার মনটা আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। চল, আমি তোমাকে ঘরে দিয়ে আসি। তোমার বিশ্রামের দরকার। আমি চিরদিন তোমার আশ্রয়ে আছি, থাকবও। তুমি আমার ইহকাল, পরকাল। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না।

সত্যবতীর দু'খানা হাত ধরে বিদুর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাতেই সত্যবতীর মুখের রঙ বদলায়। একটু অপ্রতিভ হাসে। বলল : আমি এ কথাটাই তোমার মুখে শুনব বলে আশা করেছিলাম।

বিদুরের কোনো ভাবান্তর বোঝা গেল না। সত্যবতী চোখ দুটো বুজে গভীর এক প্রশান্তিতে প্রস্তরীভূত হয়ে তার হাত দুটি ধরে স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চোখ খুলে বিদুরের দিকে তাকাল। স্নিগ্ধ ও গভীর মায়াবী এক দৃষ্টি। আস্তে করে বলল : আমাকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে চল।

দ্বৈপায়নের কথাগুলো সত্যবতীকে হতাশ করল। পুত্রের শান্তভাবলেশহীন মুখের দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। খুব বিস্বাদ লাগল। সত্যবতীর চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, মা বিদুরের পায়ের তলায় মাটি নেই। পরগাছার মত সে ঝুলে আছে কৌরববংশের সঙ্গে। মানুষ হিসেবে সে খুব সৎ-ধার্মিক। সকলের সে প্রিয়। বলা যেতে পারে কৌরববংশে অজাতশত্রু সে। সে ও আমি এই পরিবারে বনস্পতির মত এক অদ্ভুত স্বার্থের বেদীপার্শ্বে পুতুলের মত স্থির হয়ে আছি। আমাদের ধমনীতে এই বংশের রক্ত প্রবাহিত হয় না। তবু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং অদৃষ্ট মিলে আমাদের দু'জনকে হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি করে তুলেছে। এটা সবাই জানে, তবু এই নিয়ে এখনও কোন ঝড় ওঠেনি। উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে সকলে খাপ খাইয়ে চলছে। সব কিছু এমন আচমকা ঘটে গেল যে কারো কিছু করার ছিল না। কিন্তু বিদুরের রাজা হওয়ার সঙ্গে অনেক কিছু জড়িয়ে আছে।

সত্যবতী ব্যথিত হয়ে বলল : তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সংসারে আত্মীয়তার বন্ধনগুলোও পলকা।

বিদুর তার অনুভূতির মধ্যে সত্যবতীর তীব্র অসহায়তা টের পেল। শরীরের মধ্যে

একটা অস্থির কাঁপুনিও অনুভব করল মনে হল। সত্যবতী একটা আশ্রয় খুঁজছে। তাকে আশ্বস্ত এবং প্রসন্ন করার জন্য বলল : ঠাক্‌মা এই তো আমি। তোমার পাশেই আছি। তুমি তো ভেঙে পড়নি কখনও। আজ নিজেকে বিপন্ন মনে করে অস্থির হচ্ছ কেন?

সত্যবতী এক বিপন্ন অসহায়তা নিয়ে বিদুরের দিকে চেয়ে রইল। বলল : বাইরের মানুষটা সব নয়। নেভা আগ্নেয়গিরির বাইরে দেখে তার ভেতরের অন্তর্নিহিত আগুন কী টের পাওয়া যায়? আমার বুকের মধ্যে তেমনি এক আগুন অহরহ জ্বলছে। আমি কী করে শান্ত থাকি?

হস্তিনাপুরের ইতিহাস নতুন পথে পা বাড়াবার জন্য তৈরি। কিন্তু সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়েই যত গণ্ডগোল। দ্বৈপায়নের ঔরসজাত বিচিত্রবীর্যের তিন ক্ষেত্রজ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের মধ্যে কার রাজা হওয়া উচিত, কে বেশি যোগ্য এই নিয়েই একটা বিরোধ আসন্ন। বিরোধটা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কুল থেকে তার ও ভীষ্মের তটভূমির দিকে প্রসারিত হয়ে গেছে। পাণ্ডুকে আঁকড়ে ধরে ব্রাহ্মণরা প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টায় আছে, অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্রকে অবলম্বন করে ভীষ্ম ক্ষাত্রগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইছে। আবার বিদুরের পক্ষ নিয়ে সত্যবতী শূদ্রজাতির নব অভ্যুদয়ের স্বপ্ন দেখছে। ত্রিকোণ দ্বন্দ্বের তৃতীয় শক্তিরূপে বিদুরকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শিবির নিজ নিজ পক্ষে পেতে আগ্রহী।

সংকটের তেমাথায় দাঁড়িয়ে সত্যবতী ভাবছিল, অচেনা জায়গায় নতুন পথিককে তেমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে যেমন স্থির করতে হয় কোন পথে গেলে গন্তব্যে পৌঁছবে, তেমনি জীবনের মোড়ে দাঁড়িয়ে সত্যবতীকেও স্থির করতে হবে কার পক্ষে গেলে সব কূল রক্ষা হয়। এক্ষেত্রে আগাম ধারণা সব সময় কাজে লাগে না, প্রজ্ঞা চক্ষু দিয়ে সঠিক নির্বাচনই শেষ কথা। কারণ, সিদ্ধান্ত একবার ভুল হলে শোধরানোর আর উপায় থাকে না। সারা জীবন পস্তাতে হয় তাকে। জীবন দিয়ে দাম দিতে হয়। এসব ভেবেই সত্যবতী হস্তিনাপুরের সিংহাসনে নতুন রাজার অভিষেকের জন্য কেবলই সময় নিচ্ছিল। কারণ, সত্যবতী ভালো করেই জানে রাজনীতিতে সময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কালহরণ যত হবে, ততই বিবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, স্বার্থের সংঘাত, লোভের রূপ দিনের আলোর মত প্রতিভাত হবে। হলও তাই। সত্যবতী কাউকে কোন নির্দেশ না দিলেও নৃপতি নির্বাচনের দায়িত্বটা যে যার মত ব্যাখ্যা করল। সত্যবতী নীরব এবং নিরপেক্ষ থেকে বুঝতে চেষ্টা করল প্রকৃত ঘটনার স্রোত কোন দিকে কিভাবে গড়াচ্ছে।

ধৃতরাষ্ট্র রাজা হওয়া মানেই ভীষ্মের রাজত্ব। তাই, ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য ফিরিয়ে আনার জন্য এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র পাণ্ডুর পক্ষ অবলম্বন করে তাকেই হস্তিনাপুরের রাজা করতে চাইল। পাছে তাদের প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যায়, তাই দ্বৈপায়নকেই ভীষ্মের বিপক্ষে দাঁড় করে এক পারিবারিক বিবাদের বীজ বপন করল।

অগ্রজ বলেই সিংহাসনে ধৃতরাষ্ট্রের অগ্রাধিকার। কিন্তু অন্ধ বলেই সংকট দেখা দিল। চক্রান্তকারীরা উত্তরাধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার জন্য বলতে লাগল, শাস্ত্রে আছে অন্ধের রাজা হওয়ার অধিকার নেই। দৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে দিয়ে রাজকার্য চলে না। অন্ধরাজা দেশের ও দশের জীবনে অভিশাপ। রাজা পরনির্ভরশীল হলে সমূহ বিপদ। এজন্যই ধৃতরাষ্ট্রকে হস্তিনাপুরের রাজা করা যায় না। তারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুকে ধৃতরাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করা উচিত। কনিষ্ঠ হওয়া কোনো বাধা নয়, অযোগ্যতাও নয়। মহারাজ পুরু কিংবা শান্তনু উভয়েই কনিষ্ঠ হয়ে সিংহাসন আরোহন করেছিলেন। তা হলে পাণ্ডুর হবে না কেন? বিতর্কটা এর বেশি অগ্রসর হল না। রাজপদে বিদুরের প্রসঙ্গ কেউ তুলল না। ভীষ্মও আশ্চর্যভাবে নীরব থাকল।

সত্যবতী কৌশলে কালহরণ করতে লাগল। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের দিন যত দেরি হতে লাগল ততই একশ্রেণীর নাগরিক প্রচার করতে লাগল বিদুরের নম্র আচরণ, মধুর বচন, শান্ত, শিষ্ট ব্যবহার এবং দেব-দ্বিজে ভক্তিই তাকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে। সকলের কাছে সে শুধু আদরণীয় নয়, গ্রহণযোগ্যও। অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা-ভালবাসা, অনুরাগ তাকে তাদের কাছের মানুষ করেছে। বুদ্ধিতে, বিচক্ষণতায় নীতি-নির্ধারণে তার সিদ্ধান্তকে ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ পর্যন্ত সমাদর করে। তাছাড়া বিদুর ধর্মপ্রাণ, সৎ এবং আদর্শবান। বিচিত্রবীর্যের তিনপুত্রের মধ্যে বিদুর সর্বশ্রেষ্ঠ। কেবল পাণ্ডুরই কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। সে অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। তার মত দুর্বল ব্যক্তিত্বের মানুষকে নিয়ে রাজ্য চালানো যায় না, তিন ভাইর মধ্যে একমাত্র বিদুরের রাজা হওয়ার সব গুণগুলি আছে।

কে বা কারা কোন স্বার্থে এই প্রচারগুলি করছিল ভীষ্ম জানে না। তবে বিচিত্রবীর্যের তিন ক্ষেত্রজ পুত্রের সিংহাসনের দাবি নিয়ে বেশ একটা বিতর্ক জমে উঠল। অথচ, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ণয় নিয়ে কোন সমস্যাই ছিল না। তবু এই নিয়ে বেশ একটা সংকট তৈরি হল নগরীর অভ্যন্তরে এবং তিন ভ্রাতার মধ্যে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের নেপথ্য আয়োজন খুব চতুরভাবে এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে করা হচ্ছিল। ভীষ্মের বারংবার মনে হয়েছে রাজ্যশাসন থেকে তাকে হঠানোর সংকল্প বড় হয়ে উঠেছে। উত্তরাধিকারীর সংকটটা কারো কৌশলী পরিকল্পনায়, চতুর প্ররোচনায় এবং

নেপথ্য ইন্ধনে তৈরি। কিন্তু নেপথ্যবাসীটি কে বা কারা তা জানার জন্যই ঘটনার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখল। নিজে থাকল নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত। বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্রের অভিষেক সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করল না সে। যেমন রাজ্যশাসন করছিল তেমনই করে যেতে লাগল।

সত্যবতীই ফ্যাসাদে পড়ল। অবশেষে ভীষ্মকে তার বলতে হল, পুত্র, রাজপুত্ররা বড় হয়েছে। তাদের অভিষেক নিয়ে এবার ভাবনাচিন্তা করতে হয়। লোকে চারদিকে ছি ছি করছে। রাজ্যে হস্তিনাপুরের রাজা নির্বাচন নিয়ে এক জটলা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আর অপেক্ষা না করে কিছু কর।

ভীষ্মকে অভিযুক্ত করেই সত্যবতী কথাগুলো বলল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে চমকে উঠেছিল। একটা চাবুক যেন তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল ভিতরে ভিতরে। একটু বিষণ্ণ হয়ে বলল, অভিষেকের দিনক্ষণ স্থির করার জন্য আমাকে দায়ী করছ কেন? চিরকাল তোমার নির্দেশেই চলেছি। দিনকাল পাল্টেছে মা। নিজের ইচ্ছেয় এখন কিছু করি না। এমনিতে অনেক কথা হাওয়ায় উড়ছে। কত মিথ্যে অপবাদে, কত স্বার্থবুদ্ধির জঞ্জালে আমার সুনাম, আদর্শ ঢাকা পড়েছে। তবু আমার হয়ে কেউ প্রতিবাদ করল না। কেবল আমিই জানি এই হীন চক্রান্তের পিছনে কার কি মতলব, স্বার্থ ও উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। শুধু এই দুঃখে ও যন্ত্রণায়, লজ্জায় ও ক্ষোভে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে। তাই আগ বাড়িয়ে কিছু করার কথা ভাবি না। যখন তোমার নির্দেশ আসবে তখন অভিষেক নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করব মনস্থ করেছি। এখন রাজনৈতিক জটলাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর মধ্যে টেনে আনলে আর একটা গোলোযোগ শুধু বাড়বে। তুমি যা বলবে, তাই হবে।

সত্যবতী একটু বিব্রত হয়। একটু অপ্রতিভ হাসে। মৃদুস্বরে বলল, আমি কিন্তু খুব সাধারণভাবে কথাগুলো বলেছি। কিছু ভেবে বলিনি। তবু তোমার স্পর্শকাতর মনটি আমার কথাতে আহত হয়েছে। কারণ ছেলেরা অগ্রপশ্চাৎ অনেক কিছু জড়িয়ে বিচার করে, মেয়েরা করে না। যাইহোক, কথার বিতর্ক থাকুক। ওতে আমাদের কারো লাভ হবে না। এমনিই মনটা নানাবিধ ঝামেলায় অশান্ত। তবু এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সব কিছু নিয়ে আমাদের থাকতে হবে। আমি এ রাজ্যের সম্রাজ্ঞী, আমি তো সমস্যাকে ফাঁকি দিতে পারব না। সমস্যা যত কণ্টকিত এবং সংঘাতসঙ্কুল হোক না কেন, নিস্পৃহ ও উদাসীন থেকে দায় এড়িয়ে যেতে পারি না। তাই বলছিলাম, উত্তরাধিকারী সংকট নিয়ে একটা মীমাংসা তো করতে হবে। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ না হলে, কোনো সমস্যাই হত না।

ভীষ্ম নিস্পৃহভাবে বলল : আমায় কী করতে হবে?

সত্যবতী ভুরু কুঁচকে বলল : চমৎকার কথা! তারপর একটু গম্ভীর হয়ে ভর্ৎসনা করে বলল, নিস্পৃহ থাকা ভাল। কিন্তু কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াটা বোধ হয় ভালো নয়। এতকাল ধরে আমি শুধু নির্দেশ দিয়েছি, সফল হওয়ার ছক করেছ তুমি। আজ তার ব্যতিক্রম হবে কেন? নির্দেশ পালনের জন্য কী করলে ভাল হয় তুমি স্থির কর। একাজটা এতাবৎকাল শান্তনু নন্দন ভীষ্মই হাসিমুখে পালন করে এসেছে। সংকট সময়েও তার বুদ্ধি দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে বলে জানি, সে ধার কি ভোঁতা হয়ে গেল তবে?

সত্যবতীর নরমে গরমে মেশানো কূটভাষণ বক্রোক্তি এবং তিরস্কারের জবাব ভীষ্ম সহসা দিতে পারল না। ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইল। কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে গেল। অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। সত্যবতীর কথার ভিতরকার সত্যটুকু তাকে স্পর্শ করে থাকবে। একধরনের অপরাধীভাব করে মাথা হেঁট করে রইল। প্রায় রুদ্ধস্বরে বলল, নদীর স্রোত জিনিসটা ভারি অদ্ভুত। সময় ও জল যেন একসঙ্গে মিশে চলেছে মোহনার দিকে। তেমনি তুমি ও আমি নদীর মত একই তরঙ্গে ভেসে ভেসে চলেছি অজানা ভবিষ্যতের দিকে। একই অদৃষ্টসূত্রে বাঁধা আমরা। সেটাই আমার এবং তোমার বড় বন্ধন।

ভীষ্মের কথায় সত্যবতী বুকটা ধক করে উঠল। হঠাৎ একটু দিশাহারা বোধ করে চুপ করে থাকল। অধরে চাপা হাসি। তারপর আস্তে আস্তে বলল : তোমাকে যতটা নিরাসক্ত উদাসীন দেখায় তুমি ততটা নও। চালাকি করে আমাকে দিয়েই কথাটা বলিয়ে নিতে চাইছ। বিশ্বাস যে করে, তারচেয়ে বড় দায় বিশ্বাস যে রাখে।

হাসি হাসি মুখে সত্যবতী ভীষ্মের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল : রাজসভায় সকলকে নিয়ে খোলামনে আলোচনা করে একটা সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত নিলে কেমন হয়।

ভীষ্ম বলল : বেশ তাই হবে। কিন্তু বিতর্কের শেষ সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারব না। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারটা রাজপরিবারের। এর সঙ্গে অন্যের পছন্দ-অপছন্দ জড়ালে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে রাজ্যে। তাই বিতর্কের রাশ টেনে ধরার জন্য একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষকেই দায়িত্ব দেয়া ভাল। ভ্রাতা দ্বৈপায়নকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরূপে রাখলে সবদিক রক্ষা পায়। কারণ যাদের নিয়ে বিতর্ক তারা তো দ্বৈপায়নের ঔরসজাত সন্তান। তাঁর বিচারই সকলের গ্রহণযোগ্য হবে। যদি নাও হয়, পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তো কেউ করবে না। সেটাই বা কম কিসে?

সত্যবতী ভীষণ আশ্চর্য হল। ভীষ্ম একেবারে তার অন্তরের কথা বলল। কী ভাল লাগল তার কথা শুনে। আনন্দে বুকখানা থর থর করে কেঁপে গেল। সারা শরীরের মধ্যে এক আশ্চর্য সুখের শিহরণ টের পেল, যা দৈনন্দিন নয়, স্বাভাবিকও নয়—একেবারে অন্যরকম। বিহুল হতভম্ব চোখে সে ভীষ্মের মুখের দিকে কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল।

দ্বৈপায়ন চতুর্থবারের জন্য হস্তিনাপুরে আমন্ত্রিত হল। এই রাজ্যের কেউ নয় সে। তবু এক আশ্চর্য বন্ধনে বাঁধা। অদৃষ্ট আর পরিস্থিতি মিলে তাকে হস্তিনাপুরের রাজ্য ও রাজনীতিতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি করে তুলল। এক সামান্য ঋষি থেকে ঐতিহাসিক মানুষ হয়ে গেল সে। কালই ছিন্নমূল একটা মানুষকে চুম্বকের মত হস্তিনাপুরের রাজপরিবারের বিবিধ ঘটনার মধ্যে টেনে আনল। সে নিজে কিছু করল না। যা করার সব অদৃষ্টই করল। কথাগুলো নিজের মত করে সত্যবতীর ভাবতে ভাল লাগল। সেই সঙ্গে নানা অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক কথা মাথার মধ্যে ভীড় করল। নানা শব্দ ও গন্ধ চেতনার মধ্যে তারাবাজির উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গের মত চারদিকে ছিটকে যাচ্ছিল। শুয়ে শুয়ে মাথার উপর ছাদের নিচে চাঁদোয়ার মত ঝুলানো কাঠের কারুকাজ করা নকশার দিকে একদৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল।

দেওয়ালের বড় দর্পণের ওপর হঠাৎ চোখ পড়তে চমকে উঠে বসল। পর্দার ফাঁক দিয়ে যেটুকু দ্বৈপায়নকে দেখা যায় ততটুকুই ছায়া পড়েছে আয়নায়। সদ্য স্নান সেরে উঠে আসছে যেন। সকালের নরম রোদের আলো তার কৃষ্ণবর্ণ ভেজা গা বেয়ে যেন চুঁইয়ে পড়তে লাগল। জ্যোতিশিখার মত জ্বলজ্বল করছিল। চূড়া বাঁধা চুলের রাশ পিঠময় ছড়ানো। ভিজে বলেই শুকনোর জন্য খুলে দিয়েছিল। কপালে লম্বা করে শ্বেতচন্দনের এক তিলক পরেছে। তার অনাবৃত গায়ের ওপর একখণ্ড কমলা রঙের চাদর কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত কোনাকুনি করে বাঁধা। তাকে দেখে উল্লাসের কলধ্বনি বাজছিল সত্যবতীর বুকের রক্তে। বিপুল এক সুখের আবেগে আচ্ছন্ন চেতনার ভেতর অপরূপ ইন্দ্রজালের মত খেলা করছিল শালপ্রাংশু মহাভুজ একটি অসাধারণ পুরুষের প্রতিকৃতি।

অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে কি যেন দেখছিল সত্যবতী। নিজের অজান্তেই উঠে গেল তার দিকে। হাত ধরে খাটে এন বসাল তাকে। বলল : পুত্র তোমাকে হস্তিনাপুরের বড় প্রয়োজন। কেবল তুমিই পার এক অচল অবস্থার অবসান ঘটাতে। হস্তিনাপুরে রাজা হবে কে, এই নিয়ে এক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বলতে পার, এর একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান

করতে তোমাকে ডেকেছি। প্রার্থীরা সকলে তোমার পুত্র। তাই এক নিরপেক্ষ ও নির্ভুল বিচার তোমার কাছেই আশা করতে পারি।

সত্যবতীর বুকের গভীরে গোপন গোলাপ রাঙা স্বপ্ন ও বাসনাকে দ্বৈপায়ন দেখল। অধরে কৌতুক হাসি ফুটল। বলল : মাগো, রাজপুত্রদের মধ্যে সিংহাসনে বসবে কে, এই নিয়ে একটা জটিল তর্ক সৃষ্টি হল কেন? সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে সত্যিই কোনো সমস্যা ছিল না। তবু এই নিয়ে যে সংকট সৃষ্টি হল তার সমাধানের জন্য তুমি কি চিন্তা করছ? কাকে নৃপতি করা উচিত মনে কর।

দ্বৈপায়নের সকৌতুক প্রশ্নের সম্মুখে সত্যবতী অসহায় বোধ করল। পুত্রের মুখের দিকে সত্যবতী বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পাবল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিপন্ন অসহায় গলায় বলল : আমি নারী। রাজনীতির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতটুকু? রাজনীতি ভাল বুঝি না বলেই তোমাকে ডেকেছি।

সত্যবতীর চোখের ওপর চোখ রেখে মিট মিট করে হাসছিল দ্বৈপায়ন। বলল, সন্তানের কাছে মায়ের কোন লজ্জা নেই। নিজেকে গোপন করারও কোন দরকার হয় না। অকপটে তোমার মনের কথা ব্যক্ত করতে পার।

পুত্রের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় মুখখানা রাঙা হয়ে গেল। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগল। বিব্রত গলায় বলল, পুত্র আমাকে লজ্জায় ফেলে তুমি কী সুখ পাও? আমার মনের ইচ্ছা তোমার অজ্ঞাত নয়। বিদুরের প্রতি তোমার ও আমার সমধিক স্নেহ। নৃপতি হওয়ার সব গুণ তার আছে। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর মত সেও বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজপুত্র এবং তোমার ঔরসজাত। বিদুর অম্বিকার দাসীপুত্র। রাণীর স্বামীই তার দাসীদেরও স্বামী এই প্রথা বহু পুরনো। এই বংশের পূর্বপুরুষ রাজা যযাতির সঙ্গে শাস্ত্রমতে বিয়ে হয়েছিল দেবযানীর। শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী হয়ে তার সঙ্গে এসেছিল। দাসী শর্মিষ্ঠার গর্ভে রাজ যযাতির তিন পুত্র হয়। তাদের সর্বকনিষ্ঠ ছিল পুরু। মহারাজ যদি তাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করে দিতে পারেন তাহলে বিদুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকার অর্জনের বাধা কোথায়? এই কথাটা জোরের সঙ্গে সকলের সামনে দাবি করার জন্য তোমার শরণাপন্ন হয়েছি পুত্র। তুমি চাইলেই বিদুর হস্তিনাপুরের রাজা হতে পারে। দলিত মানবকুলের প্রতিনিধি হয়ে বিদুর হস্তিনাপুর শাসন করুক, এ আমার বহুদিনের স্বপ্ন। এরকম একটা পরিকল্পনা করে তোমাকে হস্তিনাপুরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়েছি। অদৃষ্ট আমার সহায় হয়েছে। এখন তুমি সহায় হলে ষোলকলা পূর্ণ হয়।

তা হলে কী প্রমাণ হয় বিদুর রাজা হবে। মা, নৃপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতকগুলি

অবশ্যপালনীয় শর্ত আছে। কারণ দেশের রাজাই দেশের ভবিষ্যৎ। একটা দেশ ও জাতির ভাগ্য, সমৃদ্ধি, আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলার মূলে রাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার। এ বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ মা। ভাল হলে কেউ সুনাম করবে না। কিন্তু পান থেকে চুন খসলে রেহাই নেই। যা নয় তাই বলবে লোকে। তুমিও পার পাবে না।

বিদুর হাসল। বলল : তুমি এক্কেবারে ছেলেমানুষ।

যেতে যেতে সত্যবতী হতাশ গলায় বলল, আমি মেয়েমানুষ। আমার তো কখনো কিছু করার থাকে না। শুধু ভাবার থাকে। গরীব ধীবরের মেয়ে। ভাগ্যের জোরে রাজরানী হয়েছি। ভাগ্যই আবার রাজরানী থেকে ভিখারী করেছে। আমার তো তাই দুঃখ থাকারই কথা।

বিজ্ঞের মত হাসল বিদুর। বলল, তুমি বড় অবুঝ। সব কথা সব জায়গায় বলতে নেই। কথাশুনে কারো চরিত্রের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায় না। মুখশ্রী দেখে তেমনি মানুষ চেনা যায় না।

সত্যবতী কথা বলে না। ভরন্ত দুপুরে পায়রার গদগদ স্বরে কী বলে? সত্যবতী প্রশ্ন করে নিজেকে। নিশ্চয়ই ভাললাগা আর ভালবাসার কথা বলে। বিদুরের কথাগুলো এই মুহূর্তে দ্বিগুণ ভাল লাগল। মন আলো করা দ্যুতি ছিল তার। নইলে, এমন আকাশজোড়া বিদ্যুৎ লেখার মত চমকিত হবে কেন তার ভেতরটা? সেই মুহূর্তে বিদূরের হাতটা চেপে ধরল।

দ্বৈপায়ন ভিজে চুলগুলো বাতাসে শুকিযে নেয়ার জন্য পিঠময় ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল : তোমার মত করে ভাবলে দুনিয়ার সব নিয়ম উল্টে দেয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। রাজনীতিতে ভাবের কথার কোন মূল্য নেই; তবু সেরকম ভাবের হাওয়া তোমার ঘরে ঢুকে পড়েছে। এরা কেউ তোমার মিত্র নয়। তোমাকে বিভ্রান্ত করার ফাঁদ পেতেছে এটা যদি বুঝে না থাক, তাহলে নৃপতি নির্বাচনের ব্যাপারে তুমি মাথা গলিও না। হস্তিনাপুরের অনেক শত্রু আছে। তারা চাইছে, হস্তিনাপুর টুকরো টুকরো হয়ে যাক। বিদুরকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে, হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বিদুরকে রাজা করলে, গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হবে। দলিতদের বঞ্চনা যতদিন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মুখ্য অস্ত্র না হয়ে উঠছে, ততদিন অপেক্ষা করতে হবে। তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে চাইলে তাদেরই ক্ষতি হবে।

বিস্ময়ে ভুরুযুগল কুঞ্চিত হল সত্যবতীর। নীরবে মাথা নাড়ল। দ্বৈপায়নের দিকে প্রশ্নময় ভরা উজ্জ্বল দুটি চোখ মেলে বলল : পুত্র, তোমার কথাগুলো এক ফুৎকারে

আমার আশা-আকাঙক্ষা নিভিয়ে দিল। এখন কী নিয়ে আমি বাঁচব?

দ্বৈপায়ন গভীর এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আবেগ ভরে বলল : তুমি কি বিশ্বাস কর তোমাকে নিরাশ করায় কিংবা কোনো এক গভীর সুখ থেকে বঞ্চিত করায় আমার খুব সুখ? মা, তুমি এই অন্তপুরের বাসিন্দা শুধু। এর বাইরে একটা অচেনা পৃথিবী আছে। সেখানে আছে অচেনা মানুষজন। অদ্ভুত স্বার্থের এবং স্বভাবের কিছু লোকজন। তাদের তুমি ভাল করে জান না। মানে, জানার সুযোগ হয়নি তোমার। তুমিও ভাবনি বিদুরের নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পেছনে কত আত্মকলহ লুকনো আছে। ভাবতে পারবে না, রাজপদে তার নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কী কুৎসিত লড়াই শুরু হয়ে যাবে। কারণ, উচ্চবর্ণেরা পশ্চাৎপদ দলিতদের নেতৃত্ব এবং আধিপত্যকে মেনে নেবে না। বিদুরকে যারা ভালবাসে তারাও বিদুরের শত্রু হয়ে তার পতন ঘটাতে ব্যস্ত হবে। আসলে তুমি যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আছ, তার মূলটা ধার করে নিয়েছ পুরুবংশের উদারনীতিবাদী ঐতিহ্য থেকে। আর যে সমাজ, যে জনগণের মধ্যে বিদুরের অবস্থান, তার প্রতি শাসকগোষ্ঠির কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। রাজনীতিতে তাদের কোন স্থান নেই, জনজীবনেও তারা নিজেদের সংগঠিত করতে পারেনি। নিজেরাও সংঘবদ্ধ হয়ে অবিচারের বিরুদ্ধে, জুলুমের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়নি। অগ্রগণ্য বর্ণের দিক থেকে প্রত্যাঘাত এলে তারা নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে। দলিতদের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান কোন আর্য নরপতি সহ্য করবে না। দলিতদের অভ্যুত্থানের বিচ্ছিন্ন উদ্যোগকে আর্য নরপতিরা চিরতরে কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে। এক্ষেত্রেও তাই হবে। তুমি কি শুনেছ বিদুরের রাজা হওয়ার পক্ষে কেউ তোমায় দরবার করেছে? বিদুরের রাজা হওয়ার চেয়ে শতগুণ ভাল হবে তাকে এ রাজ্যের মন্ত্রী করে দেয়া। গোটা প্রশাসনের রশি থাকবে তার হাতে। রাজার অধিক ক্ষমতা তার হাতে। তবু সেজন্য কারো কোনো প্রতিবাদ থাকবে না। জটিলতাও বাড়বে না। সাপ মরবে কিন্তু লাঠি ভাঙবে না। পশ্চাৎপদদের উত্থানের সঙ্গে শ্রেণী রাজনীতিকে যুক্ত করার এইরকম ভালো সুযোগ এর আগে আর্যাবর্তের কোন রাজার রাজত্বে আসিনি। আমার মনে হয় এভাবে তোমার আশা পুরণ হবে।

সত্যবতীর হঠাৎ একটা লম্বা ভারী দীর্ঘশ্বাস পড়ল। থমথমে গম্ভীর গলায় বলল : দলিত মানবকুলকে সভ্য ভদ্র আর্যরা কেউ মানুষ মনে করে না। তাদের কোন অধিকার স্বীকার করে না। অবহেলা, অনাদর, অসম্মান বহন করে জীবনটা কেটে গেল তাদের। উপেক্ষা, বঞ্চনা ভাগ্যের লিখন হয়ে রইল। তাকে আর বদলানো গেল না। অথচ যোগ্যতা দক্ষতা প্রজ্ঞা সবই আছে তাদের। কেবল কালো মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করাই

অপরাধ। পুত্র, জন্মের ওপর তো মানুষের হাত নেই।

মা, এসব নিয়ে বিলাপ করে কোন ফল হবে না। কখনও কখনও মধ্যপন্থা অবলম্বন করলে কার্য সিদ্ধ হয়। আমার মতে রাজা হওয়ার চেয়ে বিদুরের আমাত্য হওয়াই ভাল। প্রশাসনের মধ্যে থেকে কোনরূপ দায়ভাগী না হয়ে সে তোমার মনস্কামনা পূরণ করবে। তোমার ভাল চাই বলে, এই পরামর্শ দিলাম। বিদুর রাজা হলে তোমার অধিক খুশি হতাম আমি। কিন্তু পিতা হয়ে তার শত্রুতা করি কী করে? তার চেয়ে সহজ হবে পাণ্ডুকে রাজা করে এই বাড়ির ভিত ভাঙার সংকল্প। তুমি তো চাও দলিতদের বুকের আগুনে গোটা আর্যাবর্ত জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাক। মা, তোমার মত আমার বুকেও অম্বিকা, অম্বালিকার প্রত্যাখ্যান, ঘৃণা উপেক্ষা এবং অপমানের আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের ইন্ধন হোক তাদের উভয়ের পুত্ররা। বিদুর হবে সেই মহাযজ্ঞের ঋত্বিক। সেদিন তুমি হয়তো থাকবে না, কিন্তু ইতিহাস বিদুরকে অমর করে রাখবে। এটাই বোধহয় বিদুরের নিয়তি। মাগো, এ হল জীবনযুদ্ধে জিতবার রণকৌশল। যে কোন জয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হল নীতি নির্ধারণ।

সত্যবতী মাথা হেঁট করে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। মনের ভেতর নিদারুণ আশাভঙ্গের যন্ত্রণা তাকে অস্থির করল। মনে হল, তার একটা বিরাট হার হয়ে গেছে। আগের মত একবারও মনে হল না, কোনো হারই হার নয়, যতক্ষণ না একজন মানুষ নিজের কাছে হেরে যাচ্ছে। মনের মাটিতে দাগ কাটলেই হারটা হার হয়। সেরকম একটা হেরে যাওয়ার মনোকষ্টে তার ভেতরটা টনটন করতে লাগল।

অনেক দিক চিন্তা করে পাণ্ডুকে রাজপদে মনোনীত করা হল। রুগ্ন এবং অসুস্থ পাণ্ডুকে রাজকার্যে সর্বব্যাপারে সাহায্য করতে রাজপুরোহিত বিদুরকে মহামন্ত্রী করার প্রস্তাব দিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথমপর্ব বিনা বাধায় সম্পন্ন হল। ধৃতরাষ্ট্রের সমর্থকেরা কিংবা ভীষ্ম পাণ্ডুর মনোনয়নের বিপক্ষে একটি কথাও উচ্চারণ করল না।

সত্যবতীর পাশেই থমধরা বিষণ্ণতা নিয়ে ভীষ্ম বসেছিল। তার এমন পাথর মূর্তি সত্যবতী আগে দেখিনি। ভীষ্মের দেহে যেন প্রাণের স্পন্দন নেই। মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে। ভীষ্মের নিস্পন্দ পাথর মূর্তির দিকে তাকিয়ে সত্যবতীর বুকের ভেতরটা গুর গুর করে উঠল। নিজের উদ্বেগকে চাপা দেয়ার জন্য বলল : দেবব্রত, তোমার সম্মতি ছাড়া পাণ্ডুকে তো হস্তিনাপুরের রাজা ঘোষণা করতে পারি না। কিন্তু তুমি এতই মৌন এবং নির্বিকার যে—

কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখে সত্যবতী ভীষ্মের দিকে চেয়ে রইল। লম্বা একটা নিশ্বাস

ফেলে ভীষ্ম থমথমে গম্ভীর গলায় বলল : এত সুখের কথা। পাণ্ডুর অভিষেকে আপত্তি করব কেন? সিংহাসন তো আমার নয়। ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর মধ্যে কে রাজা হবে, সে তো তোমাকেই স্থির করতে হবে। অন্ধের জীবনের কোনও দাম নেই। অনুকম্পায় তার জীবনটা অভিশপ্ত। নিজের ভাগ্যের কাছে ধৃতরাষ্ট্র আগেই হেরে বসে আছে। সুতরাং অগ্রজের দাবিতে সিংহাসনের দাবিদার হয় কী করে? উচিত-অনুচিতের কথা জিগ্যেস করে আমাকে নিমিত্তের ভাগী করতে চাও কেন?

বিহ্বল হতভম্ব চোখে ভীষ্মের মুখের দিকে কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল সত্যবতী। ভীষ্মের ভিতরে যে বিরাট ওলট পালট ঘটে গেল তা তার ধারণায় ছিল না। ভীষ্মের আকস্মিক ভাবান্তর, শ্লেষাত্মক উক্তির মধ্যে এমন কিছু গোপন একটা ইঙ্গিতময়তা ছিল যা সত্যবতীর ভয়ের উদ্রেক করল। অনেকরকম অমঙ্গল ভাবনাও তার মনে উঁকি দিল। মনে হল, এ পরিবারের বনেদ ভাঙার প্রথম পর্যায়ের কাজটা সুষ্ঠুভাবেই করেছে। পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের সম্পর্কটা শত্রুতায় কঠিন হয়ে গেছে। পরিবারের অভ্যন্তরে বিবাদ বিভেদের যে ঝড় সে তুলল, তাকে সামাল দিতে পারবে তো।

নিজের অজান্তে সত্যবতীর অধরে বিমর্ষ হাসি ফুটল। কৌতুকের হাসি। নিজেকে নিয়েই তার কৌতুক। মানুষের ভাগ্যকে নিয়ে অদৃষ্টের কৌতুক। ভীষ্মের উপর তার যত রাগই থাক, তবু দুঃখ হয় তার জন্য। তার কথা ভাবলে বুকটা হু-হু করে। পিতাব জন্য, পরিবারের জন্য, দেশের জন্য তার বিরাট ত্যাগটা গোঁয়ারতুমিতে অন্যরকম হয়ে গেল। এজন্য নিজেই দায়ী সে। তার মত প্রচণ্ড সফল মানুষও ব্যর্থ হয়ে গেল জীবনে। এই ব্যর্থতা তাকে ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা দেয় বলেই বুকের মধ্যে অভিমানের তুফান ওঠে।

সত্যবতীর দুটি চোখ তার চোখের ওপর আটকে রইল। ভীষ্মের মুখ চোখ অপমানের তাপে তাম্রাভ হয়েছিল। পুরুষ তীব্রভাবে অপমানিত হলে তাঁর ভেতরটা প্রতিশোধে এমনই উন্মাদ হয়ে ওঠে যে, তখন সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। সত্যবতীর দুর্ভাবনা শুধু সেজন্য। প্রতিজ্ঞা শুধু বাইরে করে না, মনে মনেও করে। কথায় কথায় ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করার একটা ঝোঁক আছে ভীষ্মের। তাই বোধহয় শাস্তি পেতে হয় তাকে জীবনের সবক্ষেত্রে। এই চেনা জানা পৃথিবীতে ভীষ্ম একটু ব্যতিক্রম। সকলের থেকে একটু আলাদা। নিজের মত হতে পারার এবং থাকতে পারার জন্য দাম দিতে হয় অনেক।

একটা প্রবল অস্বস্তির মধ্যে অনেক মুহূর্ত কেটে গেল। জবাব দেওয়ার মত কথা

খুঁজে পেল না। কি করবে বিচার করতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে থমথমে গলায় তার কানে কানে বলল : পুত্র সবই বিধিলিপি। আমরা শুধু নিমিত্ত। এসব জেনে বুঝেও আমরা রাগ করি। অভিমান করি। পরস্পরকে দোষারোপ করি। তুমি ঠিকই বলেছ, অদৃষ্টের কাছে হেরে গিয়ে ভাবি, একটা বিরাট হার হয়ে গেল নিজের।

ভীষ্মের চোখে এক গভীর বিষণ্ণতা নেমে এসেছিল। সত্যবতীর কথায় একটু চমকে উঠেছিল যেন। বলল : মা এসব অপ্রয়োজনীয় কথা শোনার জন্য রাজসভায় কেউ বসে নেই। এসব ব্যক্তিগত কথার বিন্দুমাত্র দাম নেই। এখানে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, তবু বুকের দুঃখকে মেলে ধরবে না। তোমার ঘোষণা শোনার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে।

রাজসভা থেকে সত্যবতী ঘরে ফিরল। বুকটা তার কেমন করছিল। বুকের ভেতরটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল একটা পাষাণভারে।

॥ তিন ॥

কয়েক বছরের মধ্যে এমন সব ঘটনা ঘটে গেল যার উপর সত্যবতীর বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পাণ্ডুকে রাজা করে হস্তিনাপুরের রাজনীতি থেকে ভীষ্মকে ছেঁটে ফেলে যারা আত্মপ্রসাদ ভোগ করছিল, গান্ধার রাজকুমারী গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিয়ে দিয়ে তাদের সব হিসেব গোলমাল করে দিল। সত্যবতীর সঙ্গে কোনরূপ শলা-পরামর্শ না করেই ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের বিয়ের সব ব্যবস্থা একাই করল। ইচ্ছে করেই নিজেকে বিতর্কের মধ্যে টেনে আনল। হস্তিনাপুরের রাজা অন্তঃপুরে এবং রাজনীতিতে নিজের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলার জন্য ভীষ্ম যা করল তা গৃহবিবাদের একটা ভূমিকা কেবল। তাই নিজের পছন্দ করা মেয়েকে সুদূর গান্ধার থেকে হস্তিনাপুরে আনিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে প্রমাণ করল এই রাজ্যের অবাধ কর্তৃত্ব এবং অপ্রতিহত ক্ষমতার চাবিকাঠিটি তার হাতেই আছে। সে এখনও হস্তিনাপুরের মুকুটহীন সম্রাট একথাটা স্পষ্ট করে জানানোর জন্যই কুন্তী ভোজ কন্যা পৃথার সঙ্গে পাণ্ডুর যে বিয়েটা দ্বৈপায়নের ইচ্ছেতে চুপিচুপি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে মদ্ররাজকন্যা মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর দ্বিতীয়বার বিয়ে দিল। দ্বৈপায়ন যে হস্তিনাপুরের কেউ নয় সেকথাটা তাকে ভালো করে জানান দেবার জন্য বিদুরের বিয়েটা দিয়ে আরো একটা দুঃসাহস দেখাল। হস্তিনাপুরের দ্বৈপায়নের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সে এখন অবাঞ্ছিত। ভীষ্ম তার কার্যকলাপ দিয়ে পদে পদে তাকে বুঝিয়ে দিল।

যতদিন যেতে লাগল সত্যবতীর মনে নানাবিধ প্রশ্ন জাগল। লোকচক্ষুর অগোচরে ভীষ্ম ও তার মধ্যে এক নীরব লড়াই শুরু হয়ে গেছে। তাদের বিরোধের মধ্যবর্তী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দ্বৈপায়ন। ভীষ্মের সঙ্গে তার প্রচ্ছন্ন রেষারেষি ক্রমেই মর্যাদার লড়াই হয়ে উঠছে। অথচ এমনটা যে কোনদিন হবে বা হতে পারে সত্যবতী স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। ভীষ্ম চিরদিনই বাধ্য এবং অনুগত। হঠাৎই আমূল বদলে গেছে। পাণ্ডুর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পরে ভীষ্ম ভীষণ পাল্টে গেছে। যতদিন সত্যবতীর হয়ে কিংবা নাবালক ভাইদের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করেছিল, ততদিন সত্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কায় সে ছিল অত্যন্ত সতর্ক এবং সাবধানী। কিন্তু পাণ্ডু রাজা হওয়ার পরে তার আর বদনামের ভয় রইল না বলেই সে এক অন্য ভীষ্ম হয়ে উঠল। এই ভীষ্মকে সত্যবতী চেনে না। রোজকার দেখা ভীষ্মের সঙ্গে তার কোন মিল নেই।

শান্তনুর মৃত্যুর পরে একজন সম্রাটের মতই স্বাধীনভাবে এবং নিজের মর্জিতে দীর্ঘকাল ধরে রাজ্যশাসন করছিল। হস্তিনাপুরের সর্বেসর্বা ছিল সে। কিন্তু পাণ্ডু রাজা হওয়ার পর ক্ষমতা হারিয়ে মণি হারা ফণীর মত ফুঁসছে সে। পাছে পরিবারের ওপর কর্তৃত্বটুকুও হারিয়ে বসে সেই ভয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে। তাই পরিবারের হালকে শক্ত করে ধরল। পরিবারের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যত জোরাল হবে ততই রাজনীতির লাগামটা তার মুঠোয় থাকবে। ফসকে যাওয়ার ভয় থাকবে না। পারিবারিক রাজনীতি ও প্রশাসন এবং রাষ্ট্রনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই সত্যটা ভীষ্ম তার কাছে শিখে তাকেই পরাভূত করছে তার অস্ত্রে। যে ভীষ্ম সর্বদা নিজে হেরে তাকে জিতিয়ে দিয়েছে, সে এখন প্রতিপক্ষ হয়ে তার পরাজয় চাইছে। পরাভবের আতঙ্কে এবং একধরনের কষ্টে তার বুকটা টনটন করে। অথচ, একদিন অদৃষ্ট জীবনভোর তাকে জিতিয়ে দিয়েছিল। বর্তমানে তার সব সংঘাত চলেছে মনের অভ্যন্তরে নিজের সঙ্গে। সেখানে একজন মানুষকে কল্পনায় হারিয়ে দেয়ার ভেতরেও একধরনের সুখ আছে। সেই সুখের মধ্যে ডুবে গিয়ে আশ্চর্যভাবে আবিষ্কার করে নিজেকে। সত্যবতীরও সেরকম একটা উপলব্ধি হল।

ভীষ্মের ওপর পুত্রহন্তার প্রতিশোধ নিতে সে দ্বৈপায়নকে ব্যবহার করল। দ্বৈপায়নকে সব ব্যাপারে বেশি প্রাধান্য দিয়ে ভীষ্মের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলল তাকে। একটা প্রচণ্ড চাপে রাখার জন্যই ভীষ্মও পাল্টে গেল। এমন কি তার সঙ্গে সম্পর্কও আশ্চর্যভাবে বদলে গেল। এই বদলের সব দোষ সত্যবতীর নিজের। বাইরে কাউকে না বললেও একান্তে নিজের মনে তাকে স্বীকার করে। ভীষ্ম রাজ্য-সিংহাসনের উপর তার সব অধিকারটুকু ত্যাগ করে পরিবারের ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে নিজের ইচ্ছেয় নিজের

মত করে আজীবন বাঁচতে চেয়েছিল। সে যে এই পরিবারের একজন এবং তার নিজের কিছু অধিকার আছে, পরিবারের ভাল-মন্দের দায়িত্ব আছে সেটুকু নিজের মত ভোগ দখল করতে চাওয়া তার কিছু অন্যায় ছিল না। তবু পুত্র দ্বৈপায়ন তারই প্রশ্রয়ে আগ বাড়িয়ে ভীষ্মের সেই অধিকারের পৃথিবীটাকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে যে অন্যায় করেছিল তার দাম মা হয়ে তাকেই দিতে হবে। ভীষ্মের সঙ্গে তার নিজের সম্পর্কও চিড় খেয়েছে। তাদের মধ্যে এমনই একটা ব্যবধান তৈরি হয়েছে যে কারো ডাক কারো কাছে পৌঁছচ্ছে না।

উপলব্ধিটা সত্যবতীর বড় দেরী করে হল। সময়ের মধ্যে ভুল শোধরানো না হলে. সংশোধনের কোন সুযোগই থাকে না। পরে সতর্ক হওয়া কিংবা উপলব্ধি করার কোনও মানে হয় না। ভীষ্মের অভিমানটা যে ঠিক কোথায় সেটা না বুঝে বোকার মত বাহাদুরী নেবার জন্য দ্বৈপায়নকে এই পরিবারের সর্বেসর্বা করে যে অনর্থ বাঁধাল তার জন্য সত্যবতীর ভীষণ অনুশোচনা হয়। কিন্তু সত্যিই কী বাহাদুরি দেখানোর জন্যই দ্বৈপায়নকে সে আহ্বান করেছিল? প্রশ্নটা নিজেকেই করল সত্যবতী। আসলে অবচেতন মনে সে একটা নিরাপদ আশ্রয়, অবলম্বন এবং সহায় খুঁজছিল। যে সহায়কে তার নিজের বলে, দাবি করতে পারে, যার কর্তব্যের মধ্যে আছে নিবিড় এবং ভালবাসার টান। গর্ভজ পুত্রের মধ্যে তার একটা আলাদা দ্যুতি আছে বলেই একান্ত করে কাছে পাওয়ার লোভটুকু সংবরণ করতে পারেনি। কিন্তু সেই সুখটুকু পাণ্ডু রাজা হওয়ার পর বিষিয়ে গেল। শান্তিও বোধহয় চলে গেল লাগামের বাইরে।

সময় বয়ে যায়। কত ঘটনাই ঘটে গেল সত্যবতীর চোখের ওপর। সেই সব ঘটনার উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তার ইচ্ছেতেও কিছু হচ্ছে না। সে শুধু দর্শক। দর্শকের শুধু দেখার থাকে। করার থাকে না কিছু। সত্যবতীরও কিছু করার ছিল না। ভাববার ছিল বাকী জীবনটা দর্শকের আসনে বসেই ভেবে ভেবে কাটিয়ে দিতে হবে তাকে।

সময়ই সব কিছুকে বদলে দেয়। এই বদলের ওপর কারো কোনো হাত নেই। এখানে সব কিছু হঠাৎই অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যায়। কখন, কী হবে এবং কোনদিক থেকে পরিবর্তনের ঝড় এসে ওলট পালট করে দেবে কেউ জানে না। রাজা হরিশচন্দ্র কি জানতেন রাজর্ষি বিশ্বামিত্রর মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে গিয়ে স্ত্রী পুত্র নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে তাঁকে? মহারাজ বলিও কী জানতেন বামুনের ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা পূরণের জন্য পাতালবন্দী হয়ে জীবন কাটাতে হবে। আসলে প্রত্যেক মানুষের এক সত্তার সঙ্গে আর এক সত্তার এক ধরনের অদৃশ্য প্রতিযোগিতা

থাকে। সে কথা বোঝার ক্ষমতা হয়ত সকলের থাকে না, থাকলেও বাইরে থেকে বোঝা যায় না। প্রতিক্ষণ এই নীরব অদৃশ্য লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে বলে প্রতিমুহূর্ত হারজিৎ হয় তার জীবনে। তাই যার যখন সুযোগ আসে, সে তখন অন্যকে নীরবে হারিয়ে দিয়ে জয়ী হতে চায়। এ পৃথিবীতে হারতে কেউ চায় না। হারাটা বড় যন্ত্রণার, বড় কষ্টের আর অপমানের।

তাই বোধহয়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক চিত্রটা বদলে গেল। রাজা হওয়ার পরে পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের ওপর রাজকার্যের দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করে কিছুদিনের জন্য পত্নীদের সঙ্গে ভ্রমণে বেরোল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে শুনল সে আর হস্তিনাপুরের রাজা নয়। ধৃতরাষ্ট্রই এখন হস্তিনাপুরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অথচ এই ক্ষমতা হাতবদলের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে হানাহানি, রক্তপাত কিছুই করতে হল না। পাণ্ডু ফিরলে খুব শান্তভাবেই বলল : পাণ্ডু তোমার অনুপস্থিতির দিনগুলো আমার জীবনে এক অদ্ভুত উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। এ অনুভূতি কাউকে বলে বোঝানোর নয় ভাই। এখন কেবলই মনে হয়, বিধাতা চোখ ছাড়া আমাকে সব দিয়েছেন। অন্ধত্ব আমার জীবনে অভিশাপ একথাটা আর বিশ্বাস করি না। রাজকার্যও ভালভাবে করতে পারি। তবু একদল স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ, যারা রাজকার্য দেখাশোনার কাজে নিরন্তর সাহায্য করে থাকে তাদের চক্রান্তে আমি বঞ্চিত হয়েছি। সারাজীবন বঞ্চিত থাকব কেন? এ আমার সিংহাসন। এর ওপর তোমার কোনো দাবি নেই। ভাগ্যই নিজের জায়গায় এনে বসিয়ে দিয়েছে আমাকে। এতো তোমায় আর ফিরিয়ে দিতে পারিনা। অধিকার কেউ কাউকে দেয় না ভাই। অধিকারকে রক্ষা করতে হয়, কেউ কেড়ে নিলে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হয়। তাই বলছিলাম, তুমি আমি একত্রে হস্তিনাপুরে থাকতে পারি না। তোমাকে দুর্গম পর্বতাঞ্চলে পত্নীদের সঙ্গে নির্বাসিন যেতে হবে। সে ব্যবস্থা আমি করেও ফেলেছি।

বিদুরের মুখে এসব কথা শোনার পর সত্যবতীরও মনে হয়েছিল, ভাগ্যই মানুষকে রাজা এবং ভিখারী করে। তবু মানুষ নিজের পুরুষকার বলে ভাগ্যনির্মাণ করে। ধৃতরাষ্ট্রও অদৃষ্টের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে যে নতুন সৌভাগ্যের অধিকারী হল তা বিধাতার অনুগ্রহ নয়, কূটকৌশলে সে তা অর্জন করেছে। রাজধর্মে জয়ই সব শেষ কথা। রাজার কাছে ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, পিতা মাতা বলে কিছু নেই। রাজার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ থাকতে নেই। শত্রুকে নির্মূল করাই রাজধর্ম। পাণ্ডু এখন আর ভাই নয়, তার প্রধান শত্রু। ধৃতরাষ্ট্রের কাজের মধ্যে কোন ফাঁক নেই। কিন্তু চক্ষুহীন ধৃতরাষ্ট্রকে শক্তি যোগাল কে?

সারা রাত ধরে বিছানায় শুয়ে সত্যবতী সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজল। প্রথম মনে হল, শকুনিই চক্রান্তের নায়ক। বঞ্চিত ও সৌভাগ্যবানের সংঘর্ষের মধ্যে শকুনি ছাড়াও আর একজনের মুখ মনে পড়ল, সে হল ভীষ্ম। সে আছে লোকচক্ষুর আড়ালে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা খারাপ হয়ে গেল। অভিমানের সমুদ্র উথলে ওঠল বুকে। সে একজন মহিলা, তার বিমাতা। ভীষ্মের মত ব্যক্তির শোভা পায় না তার সঙ্গে সংঘাতে যাওয়া। তবু ভীষ্ম সেই কাজটাই করল। এক গভীর বেদনায় সত্যবতীর বুকটা তোলপাড় করে উঠল। নিজের ভেতরেই তার শুরু হল এক গভীর বিশ্লেষণ।

ভীষ্ম জীবনে কখনো হারেনি নিজের কাছে কিংবা অন্যের কাছে। জেতাতেই সে অভ্যস্ত। জিততেই তার ভাল লাগে। এই জেতার জন্য হারাতে হয়েছে অনেক। তবু জেদের সঙ্গে ভুলের সঙ্গে আপোস করে শুধরে নেয়নি নিজেকে। এটাই সত্যবতীর সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে। ভীষ্ম মানুষটা যেন কেমন!

তার মত স্পষ্টবাদী মানুষও পাণ্ডুকে রাজপদে মনোনীত করার সময় আশ্চর্যরকমভাবে নীরব ছিল। তার সেই অদ্ভুত নীরবতাকে ঝড়ের পূর্বাভাস বলে মনে হয়েছিল সত্যবতীর। এ ঝড় লণ্ডভণ্ড না করা পর্যন্ত থামবে না। তার আশঙ্কা কয়েক বছরের মধ্যে সত্য হল। ভীষ্মের মনের মধ্যে লুকোনো ঝড় পাণ্ডুকে হস্তিনাপুর থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেল শতশৃঙ্গ পর্বতের অরণ্যসঙ্কুল দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে। ভীষ্ম হস্তিনাপুরের সিংহাসনের অধিকার থেকে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেনি ঠিক, কিন্তু সে একটু মনেপ্রাণে চাইলে পাণ্ডুকে হস্তিনাপুর ছাড়তে হত না। পাণ্ডু হস্তিনাপুরের রাজা হোক এটা ভীষ্ম কোনদিন চায়নি বলেই তার প্রস্থানে বাধা দেয়নি। কিংবা নির্বাসন থেকে তাকে ফিরিয়ে আনেনি।

সব বিচার বিশ্লেষণ করে সত্যবতীর মনে হল ভীষ্মের সঙ্গে তার আসল বিরোধ। দ্বৈপায়ন বা পাণ্ডু কেউ নয়। পরোক্ষভাবে, তাদের লাঞ্ছিত করে তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে সে। কথাগুলো মনে হতে তার ভেতর এক নতুন প্রতিক্রিয়া শুরু হল। শরীরের ভেতর যন্ত্রণার মত কি যেন পাকাতে লাগল। সেটা রাগের নয়, দুঃখের এবং অপমানের।

সত্যবতী শান্তভাবে কিছু ভাবতে পারছিল না। মাথার মধ্যে এলোমেলো চিন্তা নিয়ে ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। নিজেকে প্রবোধ দেয়ার জন্য বলল : বয়স হয়েছে। মনের জোরও ফুরিয়ে গেছে। তাই, একটুতেই অভিমান হয়।

অভিমান হলে এক দুঃসহ আত্মনিগ্রহে ছিন্ন ভিন্ন হয় তার ভেতরটা। মনে হয়, চারদিক থেকে একটা উন্মাদ ঝড় ছুটে আসছে তার দিকে। উন্মাদ ঝড় সব কিছু

লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যাবে। এমন কি তার অহংকেও গুঁড়িয়ে দেবে। অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সত্যবতীর সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। অস্তিত্বের শিকড় ধরে কিছুক্ষণ টানা হ্যাচড়া করে দ্বিতীয় জন্মের সূচনা করে থেমে গেল। কেমন হবে এই দ্বিতীয়খণ্ডের জীবন যাপন কে জানে?

আঠারো বছর পরে পৃথা শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে স্বামীর মরদেহ নিয়ে পুত্রদের সঙ্গে করে হস্তিনাপুরে ফিরল। পাণ্ডুর হৃতরাজ্য ও সিংহাসন পুনরুদ্ধারের দাবিদার হয়ে এল। পাণ্ডুর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে এসে দ্বৈপায়ন বুঝতে পারল অল্পকাল মধ্যে হস্তিনাপুরের রাজ্য ও রাজনীতিতে ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে শীঘ্রই নতুন ধরনের এক বিবাদ শুরু হবে। তার ভয়াবহতা স্মরণ করে বৃদ্ধা জননীর জন্য উদ্বিগ্ন হল সে। এই পর্বে জীবনযাপন যে তার শান্তিপূর্ণ হবে না এটা অনুধাবন করেই দ্বৈপায়ন মাকে প্রাসাদের বাইরে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য সত্যবতীর ঘরে ঢুকল।

তখন সন্ধ্যা নামছিল ধীরে। কুয়াশার মত আবছা অন্ধকার ধীরে ধীরে গড়িয়ে এল চারদিক থেকে। পাখীরা কুলায় ফিরছে। তাদের ডানায় পড়ন্ত সূর্যের কমলারঙের আলো। জলস্থল অন্তরীক্ষের সব বাস্তবতা হারিয়ে যাচ্ছে এক রহস্যময় আঁধারে। কাছের কোনো গাছের ডালে গলার শিরা ফুলিয়ে একটা পাখী সমানে ডাকছে। তার এই একা কান্নার কোনো সঙ্গী নেই।

মা, মাগো--পিছন থেকে ডাকল দ্বৈপায়ন। যোলো বছর পর তার গলায় আচমকা মা ডাক শুনে সত্যবতী চমকে তাকাল। মৃদু কাঁপুনি টের পেল বুকের ভেতর। দুরন্ত আনন্দে সহসা দু'চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। ব্যাকুলগলায় বলল : পুত্র! এসেছ। কতকাল পরে এলে। ব্যাকুল হয়ে তোমার অপেক্ষা করছি আমি।

মা, এখানে তুমি ভাল নেই!

আমার জন্য তোমার খুব চিন্তা হয়, তাই না।

একটা দুঃসময়ের মধ্যে আছ তুমি। এখানে তোমার নিজের মত থাকার দিন ফুরিয়েছে। এই পুরী থেকে তাই তোমাকে নিতে এসেছি। এখানে আর একমুহূর্ত থাকা চলবে না। পদে পদে অপমানিত হবে।

পুত্র! এখানে কতকালের কত স্মৃতি আমার। এসব ফেলে কোথায় যাব?

অবুঝ হয়ো না। এক নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে মা। শিগগিরি বিবাদ বিভেদের অন্তস্রোতে এ পরিবারের বনেদ ভেঙে চুরচুর হবে। খান খান হয়ে যাওয়ার সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি তোমাকে শুধু বিদ্ধ করবে। অপমানিত হবে।

সত্যবতী অসহায়ের মত বড় বড় চোখে চেয়ে রইল। আধ অন্ধকারের মধ্যে তার ব্যথাতুর বিমর্ষ চোখের চাহনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল দ্বৈপায়ন। খোলা জানলা দিয়ে ফুরফুরে শীতল হাওয়া আসছিল। সত্যবতীর শরীরের ভেতর কাঁপুনি দিচ্ছিল। ভয়ঙ্কর সব চিন্তা তার চারপাশে জড় হলো। কাঁটা ফোটার মত একটা নাম না জানা আত্মগ্লানিতে বুকটা টনটন করতে লাগল। সম্মোহিতের মতো পুত্রের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। স্তিমিত কণ্ঠে বলল : আমায় কী করতে হবে পুত্র!

দ্বৈপায়ন বলল : মা পাণ্ডব এবং কৌরবদের বিবাদ বিভেদের অন্তঃস্রোতে হস্তিনাপুরের বাতাস তপ্ত হয়ে ওঠার আগেই এ গৃহ ছেড়ে পালাও। জীবনের বাকি কটা দিন তুমি আমার কাছে থাক।

পুত্র! সত্যবতীব মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। উদ্ধত নিঃশ্বাস সহসা যেন বুকের খাঁচায় আটকে রইল। ব্যথায় টাটিয়ে উঠল। কান্না পেল। কান্না গিলে গিলে বহু কষ্টে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল : পুত্র, মায়া মোহ সংসারী মানুষের জন্মগত অভিশাপ। এসবের মধ্যে বাস করারও একটা আলাদা সুখ আছে। এর রহস্যময় আকর্ষণ ছেড়ে কোথাও যেতে মন চায় না। একদিন বলেছিলাম, এ গৃহেব বনেদ ভেঙে ফেল, মুখোশ খুলে দাও। মহাকাল আজ তার পরোয়ানা নিয়ে আমার সম্মুখে হাজির হয়েছে। দু'চোখ খুলে তাকে দেখব পুত্র। জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট, শোক তাপ, যন্ত্রণা ভোগ করেছি। এসব আমার কর্মফল।

দ্বৈপায়ন অন্তহীন বিস্ময় নিয়ে জননীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। বলল : মা, আমি কি তোমার কেউ নই? আমারও তো ইচ্ছে করে বৃদ্ধবয়সে আমার দুখিনী মাকে একটু শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করে দিই।

অমন করে বললে আমার সব বাঁধ ভেঙে যাবে।

মায়ামোহ মানুষের জন্মগত। অথচ আমার প্রতি তোমার কোনো মায়ামোহ জন্মায়নি। আমি তোমার কেউ নই।

তুই আমার সব বাবা।

কপট রগ-অভিমান করে দ্বৈপায়ন বলল : মিছে কথা। আমার প্রতি তোমার একটু ভালবাসা মমতা দায় থাকলে তুমি 'না' বলে আমায় ফেরাতে পারতে না।

সত্যবতী কথা খুঁজে পায় না। তার কথাগুলো বুকের ভেতর ঝংকারে বেজে গেল। আশ্চর্য এক অনুভূতিতে তার ভেতরটা টৈটুম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। দুই চোখে কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নভাব নিয়ে দ্বৈপায়নের মুখের দিকে চেয়ে রইল। দ্বৈপায়নও তার মুগ্ধ দুটি চোখ পেতে রাখল সত্যবতীর চোখের ওপর। তার দৃষ্টির রূপ বদলাল।

জননীর মন মেপে দ্বৈপায়ন তার ভাবের ওপর আস্তে আস্তে কথা বসাল। বলল : মা, নারীজাতির মায়ামোহ কিছুতে কাটতে চায় না। তাই বোধহয় দৈব নিত্যপূজা, ব্রত উপবাসের মধ্যে দিয়ে তার বিষয়মুখী মনটাকে ঈশ্বরমুখী করে তোলে। ঈশ্বর প্রেমই মানুষকে সুন্দর করে, তাকে নির্দ্বন্দ্ব ও মহিমময় করে। প্রাসাদে থেকে তুমি তাঁর মহিমা, করুণা কিছুই অনুভব করতে পারবে না। অরণ্য ঘেরা মুক্ত প্রকৃতি শান্ত, স্তব্ধতায় এবং নির্জনতাতে তাঁর বিরাটত্বকে অনুভব করা যায়। একবার ঘর ছেড়ে বেরোলেই জীবনের একটা আলাদা মানে খুঁজে পাবে। ঈশ্বরকে পাবে সমস্ত প্রকৃতিতে ও প্রাণীতে যিনি ওতপ্রোত। তিনিই তোমার অভিপ্রেত। মা, এই সংসারে থাকলে তুমি ওই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করবে, বিপদমুক্তি চাইবে, মঙ্গল চাইবে — ঈশ্বরকে চাইবে না। সংসারবদ্ধ জীব তাঁকে ছাড়া আর সব কিছু চায় কাঙালের মত, কিন্তু তাঁকে চায় না একবারও। অথচ এই ঈশ্বর তার মধ্যেই আছে। সমস্তরকম বদ্ধতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্ত হয়ে শুধু নিজের মনের ভেতর তাঁকে এক মনে ধ্যান কর। তাহলে দেখবে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই তোমার চারপাশে। তুমি তোমার একমাত্র অস্তিত্ব এবং একমাত্র চেতনা। তোমারই মনে ঈশ্বরের জন্ম হয়। এই অনুভূতির নাম দিব্যোন্মাদ। মুক্তি তাই ঘরে নয় বাইরে--প্রকৃতিলোকে। যিনি অনন্ত প্রকৃতির অধিপতি, প্রকৃতিও তাঁকে অভিভূত করতে পারে না। বদরিকাশ্রমের পাহাড় ঘেরা অরণ্য পরিবৃত মুক্ত প্রকৃতিলোকে তোমায় নিয়ে যাব। সেখানে বনে বনান্তরে, পাহাড়তলিতে, প্রান্তরে উপত্যকায় এত অফুরন্ত মুক্তির হাতছানি যে কোন অভাবই বোধহয় না। সেখানে অন্য এক সুখ ও শান্তিতে তুমি ভরপুর হয়ে থাকবে।

শুনতে শুনতে সত্যবতী কেমন যেন তন্ময় হয়ে যায়। ভেতরটা তার এক অনির্বচনীয় সুখে আনন্দে ভরন্ত কলসের মত ভরে যেতে লাগল। সমস্ত শরীরটাই হিমবাহের মত গলে গিয়ে নিঃশব্দে ভক্তির সমুদ্র হয়ে দেবলোকের দিকে যেন চলেছে। তার মনে হচ্ছিল অনন্তবিসারী নীল আকাশ, দিগন্তে নীলাভ ছায়ায় ঢাকা পাহাড়, সূর্যালোকিত সবুজ বনানী সব যেন কেমন সুদূর আর অপার্থিব হয়ে উঠেছে। মুহূর্তে একটা মহৎ, উদার ও পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা, আর তীব্র একটা আবেগে তার অন্তরটা যেন বিরাট আদিত্যবর্ণ এক জ্যোতির্ময় সত্তার কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল। হঠাৎই কান্নার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল তার বুকের অভ্যন্তরে। অভিভূত গলায় স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল : পুত্র, ফুরিয়ে যাওয়ার আগে আমাকে তুমি নিয়ে চল। আমাকে নতুন প্রাণ দাও এই মিথ্যে জীবনের অন্ধকার গহ্বর থেকে অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে হাত ধরে নিয়ে চল।

মুক্তি

টুংটাং করে গরুর গলার ঘণ্টা বাজছিল। পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে গরুদের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে বকর বকর করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে উঁচু নিচু পাহাড়ী রাস্তা ভেঙে কুটীরে ফিরছিল শবরী। মাথার ওপর জলপূর্ণ কলস। তার পায়ে নূপুর বাজছিল ঝমঝম করে। যেতে যেতে দু পাশে ফুটে থাকা অজস্র ফুলের দু-একটা নিয়ে খোঁপায় গুঁজল, কানে দিল। ডাঁটা সমেত একগোছা ফুল হাত ভরে নিল। নাকে চেপে ধরে ঘ্রাণ নিল। ফুলের সুবাসে ভেতরটা ভরে থাকল অনেকক্ষণ।

বিকেলের মরা হলুদ রোদের আলো পড়ে বনভূমি সুন্দর হয়ে উঠেছে। মায়াবী চোখ মেলে চেয়ে আছে নীল আকাশ। ঘরে ফেরা পাখিরা পাগলের মতো ডাকাডাকি করে চলেছে। প্রস্তরময় পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে প্রতিধ্বনি হতে লাগল বেশ কিছুক্ষণ।

নির্জন পথে আচমকা একজন পুরুষের দীর্ঘছায়ার সঙ্গে মিশল তার নিজের ছায়া। অমনি চমকে উঠল তার ভেতরটা। তাতেই মাথার জলপূর্ণ কলসটা টলে গেল। সামলাতে গিয়ে ফুলের গোছাটা হাত থেকে খসে মাটিতে ছড়িয়ে গেল। মাথায় কলস থাকার জন্য হেঁট হয়ে সেগুলো নিতে পারছিল না। অসহায়ের মতো ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গেরুয়া পরা মানুষটি হাসি হাসি মুখে চেয়েছিল শবরীর দিকে। তার মুখে এমন একটা নিষ্পাপ সরলতা এবং আরাত্রিক পবিত্রতা ছিল যে চোখ পেতে রাখতে কোনো শরম হচ্ছিল না। মুগ্ধ চোখে শবরীও তাকিয়েছিল তার নব দূর্বাদলের মতো অদ্ভুত গায়ের রঙের দিকে। চোখ ফেরাতে পারছিল না। মানুষের গায়ের রঙ এমন হয়! প্রশ্নভরা বিস্ময় নিয়ে উজ্জ্বল দ্বিধাভরা চোখে পুরুষটির অদ্ভুত কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে রইল। ফুলের স্তবকগুলো একটা একটা করে মাটি থেকে কুড়িয়ে শবরীর হাতে দিল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো দু হাত মেলে ধরল শবরী। মুখে তার ভাষা যোগাল না। কিন্তু বুকের রক্তের কলধ্বনিতে ভাললাগার ভাষা কল্লোলিত হতে লাগল। বিস্ময়ের কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পরে হঠাৎই এক ভীষণ লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে গেল। নিজের বিব্রত ভাবটা লুকোতে প্রশ্ন করল : ভদ্রে, আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? আপনাকে কোন ভিনগ্রহের মানুষ বোধ হচ্ছে। আপনার গায়ের রঙ অদ্ভুত। আপনি দেবতা, না মানুষ — জানি না। আমি একজন সামান্য শবর রমণী। আমাকে দেখার কী আছে?

রমণীর কথায় স্বস্তি এবং অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠল অচেনা পুরুষটির মুখে। কয়েকটা মুহূর্ত মাথা নিচু করে পাহাড়ী পথের দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটিতে ভাবল — এই মেয়েকেই সে অনেক কাল ধরে খুঁজছে। অসঙ্কোচে বলল : সুন্দরী, এই পৃথিবীরই একজন রক্তমাংসের মানুষ আমি। চারদিকে অফুরন্ত সৌন্দর্যের মাঝখানে তুমিও অনির্বচনীয় যৌবনমাধুরী নিয়ে কোনো সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে যেন নেমে এসেছ সৌন্দর্যের রানী হয়ে। এসবের মধ্যে থেকেও যদি এর দাবিদার না হতে পারি তাহলে এই সৌন্দর্যের কোনো মানে হয় না।

রূপের প্রশংসার মধ্যে কী যেন একটা লুকোনো থাকে। সেই গভীর অজানা অনাস্বাদিত বোধটা তারও বুকে বিশ্বাসঘাতকের মতো লুকিয়েছিল তা কখনও জানা হয়নি। অচেনা মানুষটির আচমকা প্রশংসায় এক দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে উঠল তার ভেতরটা। চোখের পলকে একটু অবাক জিজ্ঞাসা ঝিলিক খেয়ে গেল তার মুখাবয়বে। তারপর বেশ একটু গর্বে ঘাড়টা ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। বলল : আপনি

কে?

অচেনা মানুষটি হঠাৎই বলল : আমায় একটু জল দেবে কল্যাণী। সারাদিন হেঁটে হেঁটে তৃষ্ণাবোধ করছি।

তার সশ্রদ্ধ ডাকে মনটা ভিজে গেল শবরীর। বুকের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। এমনি মরমী গলায় তাকে ডাকে না কেউ। হীন ঘরে জন্ম বলে চিরকাল অনাদর, অবজ্ঞা, অবহেলা আর ঘেন্না পেয়েছে। তাই বোধ হয় পথিকের আন্তরিক আহ্বানে তার ভেতরটা দয়ায়, করুণায়, মমতায় ভরে গেল। অদ্ভুত আবেগে তার পাতলা ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। অসহায় দুই চোখ মেলে ধরে বলল : এমন করে আমার কাছে কেউ কিছু চায়নি। আপনি আমার পাওয়ার ঘর ভরে দিলেন। আমি শবররমণী। অচ্ছুৎ অন্ত্যজ। মানুষকে সেবা করার আমি অযোগ্য। এসব জানার পরেও আপনি জলপান করবেন?

অচেনা মানুষটি বলল : আমি বড় তৃষ্ণার্ত।

শবরীর ভেতরটা আলোড়িত হয়ে উঠল। বিস্ময়ে ললাট কুঞ্চিত হলো। অচেনা মানুষটির অঞ্জলিবদ্ধ হাতে জল ঢেলে দিতে দিতে বলল : পথিক, আমার সব ব্যথাকে তুমি গণ্ডুষ ভরে নিঃশেষে শুষে নিলে। কিন্তু আমার যে অপরাধ রাখার জায়গা নেই। দিনশেষের অন্ধকারের মতো চারদিক থেকে একটা পাপবোধ আমার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমি কী করব?

জলপান শেষ করে অচেনা মানুষটি বলল : কল্যাণী, আমি রামচন্দ্র। তুমি তো শবরী।

শবরী ব্যাকুল গলায় বলল : রামচন্দ্র! আপনি অযোধ্যার নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র! জেনেশুনে আমায় পাপের ভাগী করলেন কেন? আমি আপনার কী করেছি?

কল্যাণী, তুমি কোনো পাপ করনি। তুমি অস্পৃশ্যা কিংবা অশুচিও নও। তুমি অমৃতের পুত্রী। তোমার জল ছাড়া আমার তৃষ্ণা দূর হতো না।

আলোড়িত হয়ে উঠল শবরীর চেতনা। পুলকে, গৌরবে, আনন্দে তার দু চোখের কোল ভরে গেল জলে। কিন্তু প্রথা, সংস্কার, বিশ্বাস তার মর্মমূলে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। তাকে উন্মূল করবে কি দিয়ে? তাই এক গভীর পাপবোধের আড়ষ্টতায় সে বোবা। দাঁত টিপে ভেতরে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করতে লাগল। অস্থির যন্ত্রণায় সে হঠাৎই রামচন্দ্রের পায়ের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। চোখের জলে রামের পা দুটো ভিজে গেল।

রাম সস্নেহে তাকে দু হাত ধরে তুলল। বলল : সখী, তোমার পাপবোধের কান্নার

ভেতর দিয়েই তোমার মনের সব গ্লানি ধুয়েমুছে গিয়েছে। তোমার পরিতাপ করা সাজে না।

রামচন্দ্রের আচমকা সখী ডাকে শবরী চমকে উঠল। তার সমস্ত চেতনার ওপর নেমে এল বিহ্বলতা। তার অবাক মুগ্ধ দুচোখের দৃষ্টি রামচন্দ্রের ওপর স্থির, যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে বিস্তৃত হতে হতে আকর্ণ হয়ে ওঠে -- চিত্রিত প্রতিমার মতো অপরূপা দেখায়। তন্দ্রাভিভূতের মতো নিজের মনেই বলল : মনের সব গ্লানি ধুয়েমুছে গিয়েছে। এই কটি কথা পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে কতবার ভীরু আবেগে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। ভিতরের সব আবেগকে রুদ্ধ করে বলল : তুমি যাদু জান। কথায় আমাকে ভুলিয়েছ। এখন আমার বশে আমি নেই। তোমার সখী হওয়ার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই। কত অপরাধ যে তোমার কাছে করলাম তা তুমি জান না।

রামচন্দ্র তার কথা শুনে মৃদু মৃদু হাসে। বলল : বাইরে থেকে কোনো কিছুই মানুষকে অপবিত্র করতে পারে না। সব দ্বিধা, সংশয়ের বাধা পেরিয়ে আমায় যখন জলদান করলে, অনুতাপে ফুলে ফুলে কাঁদলে, তখনই তুমি পবিত্র হয়ে উঠেছ তোমার প্রেমে। তাই তো তুমি আমার সখী হলে। ঈশ্বর আছেন প্রত্যেক মানুষের ভেতর। কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়।

কথাটা শোনামাত্র শবরীর কাছে পৃথিবীর রঙ বদলে গেল। এক আশ্চর্য ভালোলাগায় ভরন্ত কলসের মতো ভরে উঠতে লাগল ও দ্রুত। প্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখখানা। সিদ্ধ উপাসিকার মতো তীব্র ভাবাবেশে তার দু চোখ বুজে গেল। বুকের ভেতর রামের মধুনিঃসৃত কণ্ঠের বাণীগুলো মন্ত্রের মতো নিঃশব্দে গুঞ্জরিত হতে লাগল।

রামচন্দ্র মুগ্ধ চোখে শবরীর দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত কী চিন্তা করে হঠাৎই প্রশ্ন করল : সখী, তুমি কোথায় থাক? কে তোমার পিতা-মাতা?

রামচন্দ্রের প্রশ্ন শুনে বিদ্যুৎচমকের মতো চমকে তাকাল শবরী। আর্তনাদ করে উঠল তার ভেতরটা। কান্নায় ভাঙা ভাঙা গলায় বলল : না না -- আমি পারব না বলতে। অনেক আগে আমার অতীতটা হারিয়ে গেছে। বলেই সে নিশ্চল হয়ে বসে পড়ল একটা টিবির উপর।

দূরে পাহাড়ের আড়াল থেকে রাখালের বাঁশির সুর বেজে উঠল। নির্জন বনভূমি সচকিত করে দিয়ে সেই বাঁশির সুরের মূর্ছনা তাকে উন্মনা করে দিল। পুব আকাশে সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল করছে। দূর দিগন্ত অবসন্ন রাত্রির রঙে মলিন হয়ে এল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন বনপথের দিকে তাকিয়ে রামচন্দ্র মধুর কণ্ঠে বলল : চল তোমাকে আশ্রমে

পৌঁছে দিই।

পাশাপাশি হাঁটছিল তারা। উদার পবিত্র অনুভূতির একটা মধুর আবেশ ছড়িয়ে গেল শবরীর সমস্ত চেতনায়। আর তীব্র একটা আবেগে তার অন্তরটা যেন রামচন্দ্রের বিরাট মহানুভবতার কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল। রাখালিয়া বাঁশির সুর বুকের গভীরে বেদনার করুণ মূর্ছনায় বাজতে লাগল শবরীর। মনের অনেক অনেক নিচে গহনলোকে কলঙ্কিত জীবনের যে লজ্জা, দুঃখ, আত্মগ্লানি জমা হয়ে আছে, তার ইতিহাস কেউ টের পায় না। অথচ, ভারী পাথরের মতো ব্যথায় ভার হয়ে থাকে বুকের গভীরে। কিছুতে ভুলতে পারে না তার গল্প।

আচ্ছন্নতার ভেতর অস্পষ্ট কুয়াশার মতো ফুটে উঠল ঋষি মতঙ্গের শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত ভারী মাংসল মুখখানা, আর শবরপল্লীর জীর্ণ পরিত্যক্ত কুটীর। নিজের অজান্তে মুক্তোর মতো দু ফোঁটা অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ল তার গাল বেয়ে। হাঁটতে হাঁটতে শবরী বলতে লাগল তার গল্প।

অনেককাল আগের কথা। শবরপল্লীর জীবন ভাল লাগেনি শবরীর। পাহাড়ের উপর ঋষিদের যে আশ্রম, সেখানে তার মন পড়েছিল। খুব ইচ্ছে করত আশ্রমের একজন পরিচারিকা হয়ে সে রোজ ঋষিদের পাদ্য-অর্ঘ্য দেবে, পূজার ফুল চয়ন করে আনবে, যজ্ঞের সমিধ বহন করে আনবে বন-বনান্তর থেকে। তারপর নিবিষ্ট হয়ে বেদগান শুনবে, পূজার আবতি দেখবে, মন্ত্রপাঠ শুনবে। কিন্তু নিষেধের গণ্ডি ডিঙিয়ে, মমতার বন্ধন ছিন্ন করে তার পাহাড়ে যাওয়া হলো না। মনের ইচ্ছে মনেই রয়ে গেল।

সময় থেমে রইল না। চোখের অগোচরে নিঃশব্দে দেহের রূপান্তর ঘটতে লাগল। নারীত্বের সব লক্ষণগুলো একে একে প্রকাশ পেল শরীরে। কোষে কোষে নিদ্রিত নারীত্বের ঘুম ভাঙার গান। অকস্মাৎ একদিন টের পেল সে আর মেয়ে নয়, রমণী। তার বিয়ের কথাবার্তা যেদিন উঠল, সেদিন অনুভব করল তার সমস্ত সত্তার ভেতরে আর এক জ্যোতির্ময় সত্তার অস্তিত্ব। আর ঘরে মন বসল না। একদিন নিশুতে রাত্রে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে পাহাড়ের ওপর দিকে উঠতে লাগল।

যখন পৌঁছল সেখানে, তখন সূর্যোদয়ের মুহূর্ত। আকাশে নানা রঙের হোলিখেলা। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জ। তন্ময় হয়ে মতঙ্গ মুনি সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখছিলেন, আর মনটা কেমন দীন হয়ে গেল তাঁর। অঞ্জলিবদ্ধ করে সূর্যপ্রণাম করলেন। নিরুচ্চারে নিজেকে জিগ্যেস করলেন, অন্তরের এই বিগলিতভাবকেই কি ভক্তি বলে?

নিঃশব্দে আশ্রমে প্রবেশ করেছিল শবরী। কুটীর-অঙ্গনে সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে

দাঁড়িয়ে আছে জটাজুটধারী এক প্রবীণ ঋষি। স্নিগ্ধ আঁখি, প্রশস্ত মুখ, তপ্ত কাঞ্চনের মতো গাত্রবর্ণ, গৈরিক বসন, গৈরিক উত্তরীয়, হাতে কমণ্ডলু, গলায় রুদ্রাক্ষ। মুনির চরণতলে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে শবরী প্রণাম করল তাঁকে। ঋষির তন্ময়তা ভঙ্গ হলো। আচ্ছন্নতা ভাব দূর হলো। বিস্মিত মুনি সুধাস্নিগ্ধ স্বরে শুধালেন : কে তুমি মা? এখানে এসেছ কেন?

ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে বলল শবরী : পিতা, তোমার এক অভাগা কন্যা আমি। আমাকে তোমার পায়ে স্থান দাও। তোমার আশ্রমের কাজে আমি নিজেকে উৎসর্গ করতে এসেছি। দয়া করে তুমি শুধু থাকতে দাও।

শবরীর ব্যাকুল অনুনয় মতঙ্গ মুনির মন ছুঁয়ে গেল। তাঁর হৃদয় ভাসিয়ে নামল করুণা। মধুর কণ্ঠে বললেন : মাগো, তোমার পরিচয় কী? কোন গোত্রে তোমার জন্ম? তোমার পিতা-মাতা কে? কোথায় তাদের বাস? শবরীর ভেতরটা আর্তনাদ করে উঠল। যথাসম্ভব আবেগ সংযত করে যন্ত্রণায় উচ্চারণ করল : জানি না। শবর দম্পতি পালিতা গোত্রহীন এক মানবী আমি।

মতঙ্গ মুনির দৃষ্টিতে বিস্ময়! আশ্চর্য আর অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে তাঁর ভেতরটা টইটম্বুর হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শবরীর দিকে তাকিয়ে তার সততার পরিমাপ করলেন যেন। ঈশ্বরের অনন্ত মহিমার কাছে নিবেদনের এক সকরুণ ব্যাকুলতা তার অভিব্যক্তিতে, আচরণে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। মতঙ্গের বুকে সহানুভূতির সমুদ্র উথলে উঠল যেন।

ঋষিকে নির্বিকার দেখে শবরী মায়াবী গলায় ব্যাকুল হয়ে ডাকল : পিতা!

তার ডাক শুনে এক অনির্বচনীয় সুখ আর তৃপ্তিতে ভরে গেল মতঙ্গ মুনির বুক। তবু দ্বিধাহীন হতে পারলেন না। নিজের মনের ভেতর ডুব দিয়ে কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে শবরীর দিকে তাকিয়ে প্রায় শব্দহীন স্বরে বললেন : শবরী, তোমার কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছি। এই তপোবনে তুমি আশ্রম-ভগিনী হয়ে থাক। তুমি হবে তাদের প্রেরণার উৎস। তোমার ভেতর আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করছি। তোমাকে সেই কাজে নিবেদন করলাম।

কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল শবরীর চিত্ত। মতঙ্গের শ্বেতপদ্মের পাপড়ির মতো পা দু খানি জড়িয়ে ধরে সে শুধু তার ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করল না, চোখের জলে পা দুটো ভিজিয়ে দিয়ে চুল দিয়ে মুছে দিল।

দূরে দাঁড়িয়ে শিষ্যরা দেখল। তাদের চোখে বিস্ময়।

দেখতে দেখতে শবরী আশ্রমের প্রাণ হয়ে উঠল। তার সেবা ও পরিচর্যায়, নিষ্ঠা ও

সততায় আশ্রমের রূপ বদলে গেল। তপোবনের মাটিতে প্রাণের জোয়ার এসে লাগল। স্বার্থহীন দানে পূর্ণ হওয়ার এক আদর্শ সৃষ্টি হলো। নিজের জন্য সে কিছু চায় না। কিন্তু কি ভালোবাসা, কি ত্যাগ, কি অজস্র সেবা এবং মমতা দিয়ে সবাইকে ঘিরে রেখেছিল সে। একদিন বয়সের আগুনের ঝাপ্টা আশ্রম বালকদের দেহে-মনে লাগল। আশ্রম-জীবনে এক মহা-অনিয়ম দেখা দিল।

একদিন মতঙ্গ মুনি নিজের কুটীরে তাকে ডেকে বললেন : শবরী! প্রকৃতির নিয়মে ফুল ফোটে, ফল হয়। যৌবন ধর্মের নিয়মে তেমনি তরুণ তাপসেরা তোমাতে আসক্ত। বিশৃঙ্খলার হেতু তুমি।

পিতা! চমকানো বিস্ময়ে আর্ত গলায় উচ্চারণ করল শবরী।

পুত্রী, তরুণ তাপসদের পাঠে মন নেই, যাগ, যজ্ঞ ও পূজায় নিষ্ঠা নেই। সব কাজে তারা ভীষণ অমনোযোগী। তোমার যৌবনতপ্ত শরীর তাদের একমাত্র আলোচনার বস্তু। তাদের দেহে-মনে পাপ প্রবেশ করেছে। অথচ, একদিন বহু প্রত্যাশা নিয়ে তোমাকে আশ্রমে রেখেছিলাম। অপরাধী না হয়েও অপরাধের ভাগী হচ্ছ তুমি এটা আমারও দুঃখ। সকলের মঙ্গলের কথা ভেবেই — কথাটা সমাপ্ত করতে পারলেন না মতঙ্গ মুনি।

শবরীব মুখে-চোখে অসহায় ভাব ফুটে উঠল। জলভরা দুই চোখে মতঙ্গের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল : ভাইযের চোখে যাদের দেখি, ভাই বলে যাদের ভাবি, তারা এত নীচ, এত জঘন্য মনে করতেও ঘেন্না হয়। পিতা, তাদের পাপের শাস্তি আমায় ভোগ করতে হবে কেন? আমি তো কোনো দোষ করিনি।

মতঙ্গ মুনি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন : মানুষের মধ্যে লুকোনো শয়তানটাকে অন্ধকার থেকে আলোয় যে বার করে আনল সে তুমি। তুমিই কারণ। তোমার জন্য তাদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে, তাদের দেহ-মন অশুচি হচ্ছে। প্রতিদিন তারা এক আশ্চর্য মরণে মরছে।

শবরী নিরুপায় অসহায় গলায় বলল : পিতা, হরিণের মাংসই হরিণের বৈরী। মেয়েমানুষের এই দেহটাই মেয়েমানুষের শত্রু। বিধাতা একে রক্ষা করার মন্ত্র দেয়নি তাকে।

পুত্রী! বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তো এই আশ্রমের পিতা। কর্তব্যে মানুষকে কঠোর হতে হয়। আশ্রমের মঙ্গলের কথা ভেবেই তোমার আর এখানে থাকা হবে না। প্রকৃতির নিয়মে আশ্রমবাসীর জীবনে তুমি অভিশাপ, তাদের সাধনার বিঘ্ন।

গভীর দুঃখে, অপমানে, অভিমানে ভারী হয়ে উঠল তার মন। বুকের ভেতর যন্ত্রণার সমুদ্র উথাল-পাথাল করতে লাগল। অধীর চিত্তকে সংযত করে আস্তে আস্তে মৃদুস্বরে বলল : পিতা, এত নিষ্ঠুর হলে কেমন করে? এত বড় কঠিন শাস্তির কথা উচ্চারণ করতে তোমার কষ্ট হলো না? মেয়ে বলেই কি এত অবহেলার পাত্র! পৃথিবীর সব পাপ, দোষ, অপরাধ নির্বিচারে মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তারা সব সাধুপুরুষ হয়ে গেল। আর তাদের লালসা, চিত্তবিকার, অসংযমের সব দোষ, কলঙ্কের বোঝা মেয়েরা বহন করবে কেন? তাদের সবচেয়ে বড় লজ্জা, আর ভয়ের উপর দোষ চাপিয়ে এমন অসহায় করে দাও যে তাদের দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না, নালিশ জানানোর ভাষা থাকে না। পিতা, তুমি আমাকে সৎভাবে চলার, সৎ জীবনযাপনের যে শিক্ষা দিয়েছ তার অন্যথা করিনি কখনও। তুমিই শিখিয়েছ পাপ মানুষের মনে। মনের বিকৃতি থেকে পাপের উৎপত্তি। তবু সব জেনেশুনে তুমি আমার নির্মল চরিত্রের ওপর কলঙ্কের কালি লেপে দিলে। অথচ, তাদের আত্মসংযমের শিক্ষাকে সুস্থ, সুন্দর এবং সবল করে তোলার জন্যই একদিন তাদের মধ্যে আমায় টেনে আনলে। পিতা, নারীর দেহ ও শারীরিক সৌন্দর্য যদি চিত্তচাঞ্চল্য ও ইন্দ্রিয় অসংযমের কারণ হয় তবে চৌষট্টি-কামকলার ইন্দ্রিয় উদ্দীপক ভাস্কর মূর্তি মন্দিরগাত্রে খোদাই করা হলো কেন? পূজার মন্দির তো তাতে অপবিত্র হয়ে যায় না? ঐ সব মিথুন মূর্তি দেখেও ভক্তের হৃদয়ে কোনো চাঞ্চল্য জাগে না কিসের জোরে? তোমার শিষ্যদের ভেতর অনুরূপ একটা আরত্রিক ভাব তুমি জাগাতে চেয়েছিলে, কিন্তু পারলে না। তোমার শিক্ষার ব্যর্থতার সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কী সত্যিই দায়মুক্ত হওয়া যায়? তাতে কি তোমার ব্যর্থতা চাপা পড়বে? সত্য গোপন থাকবে? তুমি কি শান্তি পাবে? তোমার বিবেক তোমাকে ক্ষমা করবে?

স্তব্ধ বিস্ময়ে মতঙ্গ মুনি নির্বাক। রূপসী শবরীর মধ্যে থেকে এ কোন বিষধর ফণা তুলে ধবল? বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে গেল। শবরীর চোখের দিকে স্থির অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো, তাঁর রোজকার দেখা শবরী কত অচেনা! আশ্রয়হীনা এক বালিকার অকপট সত্যভাষণ একটা সোনার চাবি হয়ে তাঁর অজ্ঞানতার গুহার দরজাটা খুলে দিল। বিস্ময়ে বললেন : এমন করে নিজের ভেতরটাকে কোনোদিন দেখা হয়নি। আজ আমার সত্যদর্শন হলো। সত্যের অপরূপ জ্যোতির্ময় মূর্তি তোমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করলাম। কী তার তেজ! কী দীপ্তি!

পিতা! অভিভূত গলায় ডাকল শবরী।

মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হলো মতঙ্গের গোলগাল মাংসল মুখখানা। মর্মছেঁড়া

যন্ত্রণায় তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। মুখখানা সহসা কঠিন হয়ে উঠল। ঢোক গিলে বললেন : উপগুপ্ত কে?

অভিভূত গলায় শবরী বলল : আমার জীবনদাতা। একদিন সরোবরে তোমার পূজোর পদ্ম তুলতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছিলাম। উপগুপ্ত আমায় উদ্ধার করেছিল।

তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক?

কৃতজ্ঞতার। বন্ধুত্বের।

দ্বারদেশে দাঁড়িয়েছিল শুদ্ধসত্ত্ব। সরোষে বলল : আচার্য, মিথ্যে কথা। উতথ্য ওকে উপগুপ্তর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতে দেখেছে। স্বেচ্ছায় তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে প্রেম নিবেদন করেছে।

শবরী রাগে, অপমানে, লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। প্রতিবাদ করতে ঘেন্না হলো তার। তাকে নীরব দেখে দীর্ঘতমা প্রশ্ন করলেন : নীরব কেন? জবাব দাও? কথা ও কাজে তোমার সততা আর সত্যতা কোথায়?

নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না শবরী। দু হাতে মুখ ঢেকে সে ককিয়ে কেঁদে উঠল। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল। দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলল : হায়রে অদৃষ্ট! শয়তানরা আমাকে সুখে থাকতে দেবে না। আমার সামান্য সুখটাও তাদের সহ্য হয় না।

শুনেছেন আচার্য!

শবরী সরোষে শার্দূলের মতো গর্জন করে বলল : সব মিথ্যে। সব ষড়যন্ত্র। ওদের বুকে ঈর্ষার হলাহল। বুকফাটা হাহাকারের মতো কথাগুলো শোনালো।

উদ্‌ভ্রান্ত আর নিষ্পলক দৃষ্টিতে শবরীর দিকে তাকিয়ে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে লাগলেন মতঙ্গ মুনি! শবরীর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে তার অশ্রুসিক্ত মুখখানি নিজের চোখের সামনে মেলে ধরে আস্তে আস্তে বললেন : পুত্রী, ভুল যা করেছি আমিই করেছি। সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে। আমার ভুলে তোমাকে শাস্তি পেতে হচ্ছে, এটা মনে হলে নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। আশ্রম তোমাকে আর চায় না এখানে। কথাগুলো বলতে মতঙ্গ মুনির বুক ফেটে গেল। কিছুতেই চোখের জল সংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর দণ্ডাদেশে যে গভীর স্নেহ এবং মমতা মেশানো, শবরী তার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে টের পেল।

তাই সে প্রতিবাদ করল না। আস্তে আস্তে মতঙ্গ মুনির কুটীর থেকে বেরিয়ে এল তার নিজের কুটীরে। সেখানে অঝোরে কাঁদল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর রাত্রি গভীর হলে তপোবন ছেড়ে চলে গেল পাশের গাঁয়ে।

কিছুদিন পরেই মতঙ্গ মুনির কঠিন পীড়ার খবর পেয়ে সে ছুটে গেল তাঁর কুটীরে। মন-প্রাণ দিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করেও তাঁকে বাঁচানো গেল না। মৃত্যুকালে সস্নেহে শবরীর মাথায় হাত রেখে বললেন : মা, তোমার ওপর অনেক অবিচার করেছি। আমার ওপর অভিমান করে থেকো না। একদিন তোমার জন্য শ্রীরামচন্দ্র পদার্পণ করবেন এই আশ্রমে। তোমাকে তাঁর ভীষণ দরকার। সেদিন তাঁর সাহায্যে নিজেকে উৎসর্গ করলে তোমার স্বর্গলাভ হবে। তিনিই তোমার মুক্তিদূত। যতদিন তিনি না আসেন ততদিন আশ্রমপ্রান্তের অতিথি কুটীরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবে।

রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে মনের মধ্যে তাঁর কথাগুলো কেবলই মনে হতে লাগল। গল্পে গল্পে তারা উভয়ে কুটীরে পৌঁছল। পথে কতবার মনে হয়েছে রামচন্দ্রকে জিগ্যেস করে সত্যিই কি তাকে ভীষণ দরকার তাঁর? শরমে সে কথাটা একবারও জিগ্যেস করতে পারেনি।

আশ্রমে এলে রামচন্দ্রই বলল : প্রিয়সখী, তোমার মধুর সান্নিধ্যে ধন্য হলাম। তোমাকে যদি আমার কখনও দরকার হয়,অনুগ্রহ করবে তো?

শবরী কথা বলতে পারে না, বুকের ভেতরটা দুরন্ত আবেগে থর-থর করে কেঁপে উঠল বারংবার। গভীর একটা সুখের ভেতর ডুবে যেতে যেতে যেন চোখ বুজে একটা লম্বা শ্বাস নিল। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে শবরী নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল। তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক। এক মায়াবী আলো যেন ঘিরে আছে তার মুখমণ্ডলে। এমন করে একটি পুরুষের ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তার কিছুমাত্র সংকোচ কিংবা অস্বস্তি ছিল না। বরং ভাল লাগছিল। হঠাৎই মজা করার জন্য বলল : অনুগ্রহ না করলে কী করবে?

এরকম একটা কথা শোনার জন্য রাম প্রস্তুত ছিল না। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে শবরীর মুখের দিকে তাকাল। হাসি হাসি মুখ করে বলল : প্রিয় সখীর কাছে আমি এক কঠিন সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

শবরীর মুখে দুষ্টু হাসি, চোখে কৌতুক। ভুরু টানটান করে বলল : ওরকম প্রত্যাশার কোন মানেই হয় না। ইচ্ছে করলেও সব পাওয়া যায় না। তার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। বিনামূল্যে কোনো কিছু পাওয়া যায় না।

রামচন্দ্র সহসা গম্ভীর হলো। বেশ বুঝতে পারল, শবরী তার সঙ্গ ও সান্নিধ্য উপভোগের আনন্দে ও লোভে এমন চটুল কথাবার্তা বলে সময়টাকে বিলম্বিত করছে। তার মনের ভাব বুঝতে পেরে রামচন্দ্র বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বলল : শবরী, মানবমুক্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছি। আমার চলার পথে একজন নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী আমি। আমার জীবনকাননে অনেক ফুলের মধ্যে তুমিও একটি ফুল।

মাতৃপূজায় যেদিন নিবেদিত হবে সেদিন তোমার মুক্তি। সখী, রাত হয়েছে। এবার আমায় উঠতে হবে।

কথাটা শুনে শবরী কেমন যেন হয়ে গেল। স্বপ্ন থেকে চোখ মেলল বাস্তবে। বুকের মধ্যে কিসের একটা তরঙ্গ বয়ে গেল যেন। দুই চোখ টলটল করে উঠল জলে। তীব্র হতাশায়, দুঃখে নারীসুলভ একটা অভিমান ছাপিয়ে উঠল কণ্ঠে। বলল : তোমাকে তো ধরে রাখেনি কেউ। তবে অজ্ঞাতে তোমাকে অবজ্ঞার আঘাত হেনে থাকি যদি, মার্জনা কর সখা।

মৃদু হাসিতে রামচন্দ্রের অধর রঞ্জিত হলো। স্নিগ্ধ গলায় বলল : ব্যর্থ হবে না তোমার বাসনা। তোমার স্মৃতি আমার পথ চলার আলোকবর্তিকা।

ধুলার উপর পায়ের ছাপ ফেলে রামচন্দ্র এগিয়ে চলল। শবরীর চেতনার ওপর নেমে এল বিহ্বল স্বপ্ন। মনে মনে বলল : তুমি কোন যাদুমন্ত্রে মনের সমস্ত ক্লেদ, পঙ্কিলতা মুছে দিয়ে কি এক অনির্বচনীয় সুখ আর পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ করে দিলে আমার মন। ওগো হীন পতিতের বন্ধু, তোমার কথাই তোমার বাণী। আমি দুঃখী মানুষের জীবনে তোমার বাণী পৌঁছে দেব। জনে জনে শুধাব : মানুষের ভিতর ঈশ্বর আছেন। কেউ কারো ছোট নয়। পৃথিবীতে পাপ নিয়ে কেউ জন্মায় না। ভগবানের রাজ্যে সবাই সমান।

জীবনের গল্প

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপ্ত। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজা হয়েছেন। রাজ্যের ভার গ্রহণের পর পাঁচভাই মিলে এসেছেন পিতামহ ভীষ্মের আশর্বাদ লাভ করতে।

মুমূর্ষু ভীষ্ম শরাসনে শুয়ে আছেন কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে। পঞ্চপাণ্ডব তাঁর চারপরাশ ঘিরে বসলেন। যুধিষ্ঠির বসেছেন তাঁর পদতলে। পিতামহর পদযুগল ছুঁয়ে প্রণাম করলেন রাজা যুধিষ্ঠির। বললেন : পিতামহ, হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আজ আমার অভিষেক হলো। আপনি আশীর্বাদ করলেন না!

কল্যাণ হোক তোমার।

পিতামহ, এ আমার সৌভাগ্য, না দুর্ভাগ্য ; জয়, না পরাজয় -- আমি জানি না। কুরুক্ষেত্রের রক্তঝরানো যুদ্ধে অগণিত বীর যোদ্ধা, আত্মীয়-স্বজন, বান্ধব হারিয়ে আমি একটুও শান্তিতে নেই। আপনার জন্যও দুশ্চিন্তা হয়। সারা শরীরে কত যন্ত্রণা নিয়ে আপনি শরশয্যায় শুয়ে আছেন সে কথা ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়। অথচ, আপনার কাছে আমার কত শেখার ছিল, জানার ছিল -- কিন্তু এই অবস্থায় কেমন করে জিগ্যেস করি?

যুধিষ্ঠির সবদিক নজর রেখে খুব সাবধানে প্রশ্ন করলেন। তাঁর সুচতুর সতর্কতা স্মরণ করে ভীষ্ম শুকনো হাসলেন। ঠোঁটে দুটো চড়চড়ে শুকনো, একটু টান পড়লে রক্ত বেরোয়। হাসতে কষ্ট হয়। মৃদুস্বরে বললেন : বৎস, তোমার সংকোচের কিছু নেই। কুণ্ঠা করারও কোন কারণ হয়নি। জয়, জয়ই। তার ধর্ম-অধর্ম, সত্য-মিথ্যে বলে কিছু নেই। কীভাবে তুমি জিতলে সেইটা বড় কথা নয়, জয়ী হওয়াটাই আসল কথা। লোকে জয়টাকেই মনে রাখে। সেটাই তো সৌভাগ্য। জয়ের পরের দিনগুলিতে কীভাবে তোমার দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পাদন করবে তার উপরেই তোমার সাফল্য-অসাফল্য, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য নির্ভর করছে। বৎস, যাদের সাহায্য নিয়ে গৃহযুদ্ধে তুমি জিতলে তাদের দাবি মেটাতে গিয়ে তুমি দেউলিয়া হয়ে যাবে। তুমি ফুরিয়ে গেছ ভাই। তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর ক্লান্ত গলায় বিমর্ষভাবে বললেন, যুধিষ্ঠির তোমার সাফল্যের গৌরবে আমি রঙিন হয়েছি। কিন্তু শরশয্যায় শুয়ে আমি যে বাঁকা হাসি হেসেছি, তুমি তা দেখতে পাওনি। মরণ সাগর তীরে দাঁড়িয়ে তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে খুব ইচ্ছে করে। আমি তো মরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে কেন?

যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে বললেন : মানবিক কর্তব্য করা কী অপরাধ? আমাদের জন্য তো আপনাকে বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। আপনার জন্য কিছু করতে পারলে আমার নিজেরই ভালো লাগবে। একে কি আপনি অন্যায় বলবেন? ভীষ্ম কেমন যেন আঁকুপাঁকু করছিলেন ভিতরে ভিতরে। তবু তেতেও উঠলেন না, ফেটেও পড়লেন না। মিন মিন করেই বললেন, কী জানি?

যুধিষ্ঠির কারো সঙ্গে কখনো ঝগড়া বা তর্ক করেন না। কী করে সবিনয়ে যুক্তি প্রয়োগ করতে হয় তিনি তা ভালোই জানেন। ভীষ্মকে প্রসন্ন করার জন্য আপন মনেই বললেন : দুর্যোধনও আপনাকে সুস্থ করে তুলতে চেয়েছিল। শরীর জুড়ে গভীর ক্ষতগুলো সারিয়ে তুলতে সময় লাগবে। এই সময়টা ব্যথা যন্ত্রণায় আপনাকে কষ্ট

পেতে হবে। সেই কষ্ট লাঘবের বিদ্যা পূর্বদেশ ভ্রমণকালে অর্জুন শিখেছিল সে দেশের মানুষদের কাছে। যুদ্ধে আহত মানুষদের চিকিৎসার জন্য তারা তীক্ষ্ণাগ্র শরগুলিকে নিবিড় করে একই সমতায় সাজিয়ে শরশয্যা প্রস্তুত করে আহত রোগীকে তার উপর শুইয়ে দেয়। তীরগুলো এত ঘন করে বসানো যে রোগীর শরীরে তা বিদ্ধ হয় না। বরং তীক্ষ্নতার স্পর্শে রোগীর পেশী ও স্নায়ুগুলি চাঙা করে দেয়। শরীরে কোনো যন্ত্রণা থাকে না। এক অব্যক্ত আরামের সুখকর শিহরনে সে সুস্থ বোধ করে। অনুরূপ পদ্ধতিতে আমরা আপনার কষ্টের লাঘব করতে চেষ্টা করেছি।

ভীষ্ম বিমর্ষ গলায় বললেন : কী দরকার ছিল? এইভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। বেঁচে থাকাই কি জীবন!

আপনার কাছে এর কোনো প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু আমরা যে আপনাকে ভীষণভাবে চাই। সারাজীবন ধবে সততা এবং সত্যকে আপনার মধ্যে এমন করে বাঁচিয়ে রেখেছেন যা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় শিক্ষার বস্তু। আজ আপনার পদতলে রাজা যুধিষ্ঠির রাজনীতির পাঠ নিতে এসেছে। না বলে তাকে ফিরিয়ে দিতে আপনার কষ্ট হবে না?

ভীষ্মের দু'চোখ ভরে সহসা জল নামল। যে চোখের কোণ দিয়ে জল পড়েনি কোনোদিন, এমন কি যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত হয়েও যন্ত্রণায় যে মানুষ কাঁদেনি তাঁর দু'চোখ আর্দ্র হতে দেখে যুধিষ্ঠির আশ্চর্য হলেন। আচ্ছন্ন গলায় ডাকলেন : পিতামহ!

ভীষ্মের বুক কাঁপিয়ে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। বললেন : আমি একজন হেরে যাওয়া ব্যর্থ মানুষ। গর্ব করার কিছু নেই। আমি তোমাকে কী শিক্ষা দেব? তোমার রাজনীতিজ্ঞান. ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার পাশে নিজেকে অত্যন্ত নগণ্য মনে হয়।

যুধিষ্ঠির অনুযোগ করে বললেন : আপনি দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন।

না বৎস, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে রাজনীতির যে কদর্য চেহারা দেখেছি তাতে রাজনীতিতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কূট রাজনীতি আমি কতটুকু বুঝি? বুঝলে এই হার হতো না। কুরুক্ষেত্রের নোংরা রাজনীতি থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা আজ জরুরী হয়ে পড়েছে। আর সেজন্য দরকার একটা বড় পরাজয়। পরাজয়ের পথ ধরে আসবে বিশ্বস্রষ্টার মরণ। তবেই হবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

ভীষ্মের কথা শুনে যুধিষ্ঠিরেব মুখ পাণ্ডুবর্ণ হলো। তাঁব মুখভাব লক্ষ্য করে ভীষ্ম বললেন : জীবনের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা থাকে। সেগুলো অমন ভয়ঙ্করভাবে গ্রহণ করতে নেই। এও এক খেলা। আমি চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছি রাজনীতিতে

শত্রু-মিত্র নেই। আজ যে বিপক্ষ কাল সে স্বপক্ষ। আজ যে আমার দলে, কাল সে অন্য দলে। এখানে নীতি, আদর্শ, ধর্ম বলে কিছু নেই। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তাই রাজনীতির কথা বলতে ভালো লাগে না। রাজনীতিতে কোনো সুখ নেই। জীবনের সুখ, আনন্দ, সুন্দর অনুভূতিগুলিকে বিবর্ণ এক ভোঁতা করে দেয়। মানুষ অমানুষ হয়ে যায়।

যুধিষ্ঠিরের মুখে কথা যোগায় না। কেমন অন্যমনস্ক এবং বিমর্ষ দেখাচ্ছিল তাঁকে। ভীষ্ম তাঁর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বললেন, আমার কথাটা বুঝলে না ভায়া। এক ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও ক্ষুদ্র প্রাণী কী কৌশলে আত্মরক্ষা করে আমরা ভাবতেও পারি না। না-মানুষীদের নিয়ে সেরকম একটা উপাখ্যান বলি শোন।

বিশাল প্রান্তরের মধ্যস্থলে এক বিরাট-প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ রাজোচিত মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। ডালপালা মেলে অনেকখানি প্রান্তর অধিকার করে আছে। ডাল থেকে নামা ঝুরিগুলো থামের মতো। পাহারাদার হয়ে পাহারা দিচ্ছে যেন। ঐ গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় এবং নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে প্রাণীকুল উপরে নিচে বাস করে। তারা একজায়গাতে পাশাপাশি বাস করে। কিন্তু তারা কেউ কারো বন্ধু বা প্রতিবেশী হয়ে উঠতে পারেনি। তাদের সম্পর্কটা অবিশ্বাস এবং সন্দেহের। বৈরীর মতো একে অন্যের উপর সতর্ক নজর রেখে অবিশ্বাস নিয়ে সহাবস্থান করে। এ এক অদ্ভুত জঙ্গলের জীবনযাত্রা।

যুধিষ্ঠির প্রশ্নভরা উজ্জ্বল চক্ষু মেলে ভাইদের দিকে তাকালেন। নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

ভীষ্মের দু'চোখ বোজা। কণ্ঠস্বর শান্ত অথচ কোমল। ভীষ্ম বলতে লাগলেন : জীবনে মাঝে মাঝে এমন অনেক কিছু আকস্মিকভাবে ঘটে যায় যার পূর্বাভাস ঘটনাটি না হওয়া পর্যন্ত জানা থাকে না। সংকট সময়ে একজন পরম শত্রুও হঠাৎ মিত্র হয়ে যায়, এবং মিত্র শত্রু হয়। এ এক আশ্চর্য জীবন নীতি। রাজনীতি পাঠে শত্রু-মিত্র নির্ণয়ের প্রাথমিক জ্ঞানটুকু থাকা খুবই জরুরী। শত্রুকে কখন মিত্ররূপে ব্যবহার করতে হবে, এবং কখন তার সংস্রব থেকে দূরে থাকতে হবে তার সময় নির্ণয়ের জ্ঞান সকলের সমান হয় না। যার সে জ্ঞান নেই, না-মানুষীদের বাঁচবার কৌশল থেকে সে তা শিখতে পারে।

পঞ্চপাণ্ডব থমথমে মুখ করে এ ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ভীষ্মের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। তাদের প্রশ্ন করার আগেই ভীষ্ম বললেন : স্থবির মহাবৃক্ষের নিচে এক জীবন নাট্যের শুরু হলো মধ্যরাতে। পাঁচটি প্রাণী এই নাটকের পাত্র-পাত্রী। প্রাচীন অশ্বত্থগাছ,

আকাশের অগণিত নক্ষত্র আর কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ তার নীরব দর্শক।

প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের মূলদেশে বহুকালের বাসিন্দা পলিত নামে এক ইঁদুর। জ্ঞানসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান। পাছে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হয় তাই শতমুখ গর্তের গোলকধাঁধা সৃষ্টি করে মাটির অভ্যন্তরে বাস করে। ঐ গাছের ডালে লোমশ নামে এক হিংস্র বনবিড়ালও দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে পক্ষীশাবকদের বাসায় হানা দিয়ে মনের আনন্দে তাদের ভোজন করে লোমশ। কিছুকাল পরে পরিঘ নামে এক ব্যাধ অশ্বত্থগাছের আশপাশে এসে ঘর বাঁধল। প্রতিদিন অপরাহ্নে শিকার ধরার জন্য ফাঁদ পেতে ঘরে ফিরে যায়। ভোরে এসে পাশবদ্ধ পশুদের সংগ্রহ করে। এইভাবেই দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন ছন্দপতন হলো তার। ক্ষুধার তাড়নায় লোমশ এদিক ওদিক দাপিয়ে বেড়াতে বেড়াতে পরিঘের জালে আটকা পড়ল। পাশবন্ধন মুক্ত করতে গিয়ে দড়ির ফাঁসে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ল। গর্তের মধ্যে শরীরটাকে আড়াল করে খুদে খুদে চোখ মেলে পলিত তা দেখল। লোমশের নড়াচড়ার শক্তি ছিল না। চর্তুদিক ভালো করে নিরীক্ষণ করে নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে পলিত গর্ত থেকে বেরিয়ে মনের সুখে আহার খুঁজতে লাগল। লোমশের খুব কাছেই একটি কীটকে নড়াচড়া করতে দেখে নির্ভয়ে প্রাণীটিকে শিকার করল। পলিত দেখল লোমশ ক্ষুধার্ত চোখ মেলে কাতর দৃষ্টিতে অসহায়ের মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে। পলিত জানে তার এই হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহটির উপর লোমশের লোভ খুব। কিন্তু সে এখন পাশবদ্ধ। তার অসহায় অবস্থা দেখে পলিত যারপরনাই খুশি হয়ে তাকে পদদলিত করার অভিপ্রায়ে লোমশের রোমে ঢাকা পিঠের উপর চড়ে পরমানন্দে শিকার ভক্ষণ করতে লাগল।

বাতাসে অকস্মাৎ কার নিঃশব্দ আগমনের সংকেত পেয়ে পলিত চমকাল। সন্ত্রস্ত চোখদুটো অন্ধকারে দেখল লোমশের মতোই তার আর এক প্রবল শত্রু হরিতও সেখানে উপস্থিত হয়েছে। কালান্তক কালপেঁচাব দুটি চোখ পুর্ণিমার চাঁদের মতো জ্বল জ্বল করছে। বাতাসে তার শরীরের ঘ্রান পেয়ে হরিত এসেছে তার বহুকালের সযত্নে রক্ষিত হৃষ্টপুষ্ট দেহটি ছিন্নভিন্ন করতে। পলিত ভয় পেল। নিকটস্থ কোনো একটি বিবরের মধ্যে আশ্রয় নেবে ভাবল। কিন্তু তার কাছের গর্তেব মুখ আগলে বসে আছে চন্দ্রক নামে এক নকুল। পালানোর সব পথ বন্ধ তার। পলিত নিজেকে খুব বিপন্ন এবং অসহায় মনে করল। মরণ তার শিয়রে। হরিতেব হাত থেকে যদিও বা রক্ষা পায়. চন্দ্রকের কাছ থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। পলিতের মনের সব হর্ষ বিষাদে রূপান্তরিত

হলো। মহাসংকটে পড়েও পলিত বুদ্ধিভ্রষ্ট হলো না। দুর্বলের একমাত্র সম্বল তার বুদ্ধিবল। তাই সাহসে সে বুক বাঁধল। বুকে ভয় এবং মনে সাহস নিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় চিন্তা করতে লাগল পলিত।

সে এখন কালান্তক প্রবল শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। সামনে কিংবা পিছনে যাওয়ার সব রাস্তা তার বন্ধ। মৃত্যু হাঁ করে বসে আছে তাকে গিলবার জন্য। পলিত নিরুপায়, অসহায় এবং বিপন্ন। অনেক ভেবে স্থির করল রজ্জুবদ্ধ মার্জার লোমশ তার প্রবল শত্রু হলেও এই মুহূর্তে সে হতে পারে তার নিরাপদ আশ্রয়। কারণ, সেও তার মতো বিপদাপন্ন। তাদের সম্পর্ক খাদ্য-খাদকেব হলেও, লোমশ এখন তার কোনো ক্ষতি করবে না। বরং উদ্ধার পাওয়ার আশায় তার মিত্র হতে পারে। বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য সন্ধিতে তার পক্ষে রাজি হওয়া কোনো আশ্চর্য নয়। কারণ অস্তিত্ব রক্ষার রাজনীতিতে চিরন্তন শত্রু মিত্র বলে কেউ নেই। কে কোথায় কীভাবে অবস্থান করছে তার উপরে শত্রু মিত্র সম্পর্ক নির্ণয় হয়। যেহেতু তাদের দু'জনের অবস্থা এক, তাই তাদের ভেতর সন্ধি হওয়া খুব সহজ ব্যাপার। লোমশ যদি বুদ্ধিমান হয় তা হলে তার প্রস্তাবে রাজি হবে।

মুহূর্তের মধ্যে এই সব চিন্তা করে পলিত লোমশকে বলল : তুমি ও আমি এই জায়গার বাসিন্দা। দীর্ঘকাল প্রতিবেশীর মতো পাশাপাশি বাস করছি। বিপদে প্রতিবেশীকে সাহায্য করা উচিত। আমরা দু'জনেই বিপদাপন্ন। দু'জন দু'জনকে অবলম্বন করে এবং আশ্রয় করে বিপন্মুক্ত হতে পারি। আস্থা ও বিশ্বস্ততা আমাদের উভয়ের রক্ষাকবচ। তুমি যদি বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার কথা মান, তাহলে আমরা দু'জনে প্রাণ সংকট থেকে মুক্ত হতে পারি। তুমিও বন্ধনমুক্ত হবে, আমিও বিপদ উত্তীর্ণ হতে পারব।

লোমশ পলিতের কথায় খুব অবাক এবং আশান্বিত হয়ে বলল ; তোমার অকপট বাক্যালাপে আমি প্রীত হয়েছি। তোমার তীক্ষ্ণ ধারাল দন্তই পারে আমার পাশবন্ধন ছিন্ন করতে। একমাত্র তুমিই আমাকে মুক্ত করতে পার। তোমার অকপট সাহায্যের প্রস্তাবে আমি রাজি। কী করতে হবে বল?

পলিত মিট মিট করে অন্ধকারের মধ্যে লোমশকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করল। তার কথাগুলি পরিমাপ করে নিয়ে বলল : তুমি হিংসা পরিত্যাগ করে যদি তোমার উদরের নিচে আমাকে আশ্রয় দাও তাহলে ঐ মাংসাশী নকুল ও হরিত হতাশ হয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু জেনেশুনে একজন পরম শত্রুকে মিত্র ভেবে আত্মসমর্পণ করা খুবই

বিপজ্জনক। তবু মাঝে মাঝে বিশ্বাস করতে হয়। বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না।

লোমশ বলল : তুমি নির্ভয়ে আমার কোলে প্রবেশ কর। আমি তোমাকে অগ্রজের ন্যায় রক্ষা করব।

হরিত ও চন্দ্রক পলিতকে লোমশের উদরের নিচে আশ্রয় নিতে দেখে হতবাক হলো। তাদের উভয়ের প্রতিবেশীসুলভ সদ্ভাব ও প্রীতি দর্শন করে পলিতের আশা ত্যাগ করল। আশাভঙ্গের বেদনায় কুপিত হয়ে হরিত ও চন্দ্রক, পলিতকে অভিসম্পাত দিয়ে প্রস্থান করল।

এদিকে পলিত, লোমশের উদরের নিচে আশ্রয় নিয়ে বহু সময় ধরে একটা একটা করে ফাঁস কেটে সময় হরণ করতে লাগল। লোমশ তার বিলম্বিত কার্যে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়ে বলল : ভাই পলিত, সময য বয়ে যাচ্ছে, দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধ পরিঘ হাজির হবে। অথচ, তুমি এখনো আমাকে বন্ধনমুক্ত করলে না।

পলিত তার কথা শুনে মলিন হেসে বলল ; বন্ধু ভয় পেও না। পলিত বিশ্বাসঘাতক নয়। আমিও এখনো সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। কালান্তক, চন্দ্রক এবং হরিত হয়তো আড়াল থেকে আমার উপর নজর রেখেছে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দু'জনেই নিরাপদে প্রস্থান করব। তুমি শুধু ধৈর্য ধরে অবস্থান কর। আমি উপযুক্ত সময় সম্পর্কে সচেতন আছি। সেই সময় কখনো উত্তীর্ণ হবে না। সময়ের কাজ সময়ে শেষ না হলে মহৎ ফললাভে বিঘ্ন হয়। তাতে কারো উপকার হয় না।

পলিত, আমি তোমাকে রক্ষা করেছি, কিন্তু তুমি আমার শঙ্কা এবং উদ্বেগ প্রশমনের কোনো কাজ করছ না। এ কী মিত্রের কাজ!

পরিঘকে দেখামাত্র তোমাকে বন্ধনমুক্ত করব। তাকে দেখলেই তোমার ও আমার অন্তরে ভয় সঞ্চার হবে। তখন উভয়েই প্রাণরক্ষার্থে পলায়নে তৎপর হব। সেই সময় তোমার সর্বশেষ বন্ধনটি ছিন্ন করে আমি দায়মুক্ত হয়ে নিজের গর্তে প্রবেশ করব। আর তুমিও পাশমুক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দে পালাতে সক্ষম হবে। প্রিয় লোমশ, বলবানের সঙ্গে দুর্বলের আত্মরক্ষার সন্ধি হয় না। হলে, দুর্বলকে খুব সাবধানে থাকতে হয়। কার্যোদ্ধার হলে বলবান বিশ্বস্ততার সম্মান রাখে না। তাই দুর্বলকেই সতর্ক হতে হয়। নইলে, তার বিপদ সমূহ।

দেখতে দেখতে ভোর হলো। কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার অসংখ্য কুকুরের সঙ্গে পরিঘকে প্রান্তরে হঠাৎ দেখা গেল। লোমশ প্রাণভয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পরিঘ নিকটবর্তী হওয়া মাত্র পলিত তাকে পাশমুক্ত করে দিল। লোমশ প্রাণভয়ে দৌড়ে গাছে উঠল।

পলিত নিরাপদে গর্তে প্রবেশ করল।

হতাশ হয়ে পরিঘ প্রত্যাবর্তন করল। বেশ কিছুক্ষণ পর লোমশ গাছ থেকে নেমে এসে বলল ; বন্ধু পলিত তোমার মতো সাহসী, বুদ্ধিমান বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা। কার্যত তোমার পরামর্শ ও বুদ্ধিতেই আমার জীবন রক্ষা পেল। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশ্বাসের পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি। আমাকে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখন থেকে তুমি আমার বন্ধু। নির্ভয়ে খোলা জায়গায় তুমি বেড়াতে পার। বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই। বন্ধুকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।

লোমশের প্রীতিপূর্ণ মধুর বচনে পলিত কিছুমাত্র আশ্চর্য হলো না। মৃদু হেসে গর্তের ভিতর থেকে পলিত বলল : এই পৃথিবীতে যথার্থ মিত্র কেউ নেই। প্রত্যেকে কিছু না কিছু স্বার্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে চলে। স্বার্থের কারণে শত্রু মিত্র হয়, মিত্র শত্রু হয়। আমাদের বিশ্বস্ততা এবং মিত্রতার কোনো অগ্নিপরীক্ষা হয়নি। আত্মরক্ষার জন্য আমরা মিত্রতায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম।

লোমশ বলল, তোমার কথা সত্য। কিন্তু বিশ্বাস, নির্ভরতা এবং আনুগত্য থেকে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। -

পলিত বলল, কোনো সম্পর্ক একদিনে গড়ে ওঠে না। প্রতিদিনের বহু ঘটনা থেকে আপনা আপনি তা তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু আমরা অনেককাল পাশাপাশি বাস করছি তবু আমাদের কারো প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালোবাসা নেই। এই জগতে সবাই স্বার্থের দাস। পিতা-মাতা আত্মীয় বান্ধব সকলে স্বার্থের বশীভূত। সেই অর্থে কেউ কারো প্রিয় নয়। স্বার্থের ঠোকাঠুকি লাগলে ঠুং ঠাং আওয়াজ হয়। কিন্তু যার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু কোনো কালে সংস্রব ছিল না তার প্রিয় বাক্যে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বাস করা নির্বুদ্ধিতা।

লোমশ পলিতের বাক্যে ব্যথিত হয়ে বলল : প্রীতি প্রদর্শন এবং সৎ-আচরণ অন্যের অন্তরে প্রণয় সঞ্চার করে। অনুরূপ এক অনুরাগে তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমার প্রাণরক্ষকের প্রতি তাই কৃতজ্ঞ।

পলিত তার কথা শুনে বলল ; আমার প্রতি তোমার আকর্ষণ কারণ-সাপেক্ষ। কারণের অহেতুক ব্যবহার উদ্দেশ্যকে বড় করে তোলে। তোমার অনুরাগ তেমনি আমার মনে সন্দেহ উদ্রেক করছে। আমাদের সম্পর্ক তো খাদ্য-খাদকের। এই হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহটির প্রতি তোমার লোলুপ নজর আমার অজানা নয়? সুযোগ পেলেই তুমি আমাকে ভক্ষণ করবে।

লোমশ বলল : তোবা, তোবা! এ কী নিদারুণ কথা!

পলিত বলল : একটু আগে একান্ত কাছে পেয়েও তুমি কিছু করতে পারনি। এখন মিত্র সেজে এসেছ তোমার রসনা তৃপ্ত করতে। তোমার উদ্দেশ্য ভালো নয়। আমি জীবচরিত্র জানি। একটু আগে যে শত্রু ছিল হঠাৎ মিত্র হলে সে যদি সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করে, অকারণ প্রশংসা করে, তাহলে বিচক্ষণ ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। তোমার প্রতি আমার কোনো আস্থা নেই। তুমি বোধ হয় জান না — মিত্রতা হয় সমানে সমানে। তুমি বলবান, আমি দুর্বল। আত্মরক্ষার জন্য সন্ধি করতে পারি কিন্তু মিত্র হতে পারি না। বিশেষত যে শত্রু ক্ষুধায় কাতর হয়ে কিছুক্ষণ আগে খাদ্য অন্বেষণ করছিল, যাকে দেখে ভয় পাচ্ছিলাম, যে আমার দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের কারণ তাকে বন্ধু মনে করি না। তার সংস্রব থেকে দূরে থাকা মঙ্গল। শোনো মার্জার বলবান শত্রুও বুদ্ধিমান দুর্বলের দ্বারা পরাভূত হয়।

পলিতের কথা শুনে লোমশের অন্তঃকরণে নিষাদ পরিঘের ভীতি প্রবল হলো। পাছে, পুনরায় কোনো বিপদ হয় সেই ভয়ে কালক্ষয় না করে লাফ দিয়ে গাছে উঠল। পলিতও বিবরের মধ্যে আত্মগোপন করল।

গল্প বলা শেষ হলে ভীষ্মের অধরে টেপা হাসি ধনুকের মতো বঙ্কিম হলো। পঞ্চপাণ্ডবের দুই চোখে বিস্ময়। পিতামহের গল্পের লক্ষ্য কে? তাঁর উদ্দেশ্য কী এই প্রশ্ন নিয়ে পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

মনের ক্ষত নিয়ে যুধিষ্ঠির ভাবলেন এ গল্পের লক্ষ্য সে। প্রাচীন অশ্বত্থগাছ প্রাচীন কুরুবংশের মতো সকলকে আশ্রয় এবং ছায়া দিচ্ছে। কুরুবংশের ছত্রছায়ায় আশপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নিজ নিজ অস্তিত্ব নিয়ে সম্পর্কহীন হয়ে বাস করছে। নিষাদ পরিঘকে সত্যবতীর পিতা দাসরাজের মূর্তি ধরে তার সামনে দাঁড়াল যেন। তাঁর শর্তের ফাঁদে পড়েই কৌরব পরিবারের এই দুর্গতি। যে সব ভয়ঙ্কর প্রাণী দ্বারা পলিত পরিবেষ্টিত ছিল তাদের দুর্যোধন, কর্ণ, অশ্বত্থামা মনে করলে ভুল হয় না। পলিত পাণ্ডবের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পলিতের ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং কূটনীতি একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া আর কারো মধ্যে ছিল না। তা-হলে লোমশ কে? যদুকুল? কথাটা মনে করে যুধিষ্ঠির চমকাল। এরকম একটা কল্পনার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলেন। পাপ মনকে তিরস্কার করলেন। ভুরু তাঁর বিরক্তিতে কুঁচকে গেল। ভিতরের উদ্বেগ উত্তেজনাকে সামাল দেবার জন্য যুধিষ্ঠির পিতামহকে প্রশ্ন করল : পিতামহ আপনার গল্প অনবদ্য। জীবনের গল্প। মনে হচ্ছে, আমার বিরুদ্ধে আপনার অনেক নালিশ আছে। নাম না করে

বললেও গল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর গল্প।

ভীষ্মের দু'চোখে কৌতুক, অধরে স্ফুরিত হাসি। বললেন : তোমার রাজনীতি পাঠ নেয়া সার্থক হয়েছে। কিন্তু তুমি চিরকাল সরল রয়ে গেলে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে জীবন গঠন করতে হলে আগে অনেক বিচার বিশ্লেষণ দরকার। সবচেয়ে বেশি দরকার সময় ও সুযোগের সুনিপুণ নির্বাচন। যারা তা করতে পারে লোকে বলে তারা জিতল, আর যারা পারল না তারা হারল। কথাগুলো বলার সময় ভীষ্মের দু'চোখে নিবিড় ব্যথা জমে উঠল।

নরনারায়ণ-সংবাদ

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনের প্রথম দিন। মহাযুদ্ধের সব আয়োজন সমাপ্ত। বিশাল প্রান্তরের পূর্বদিকে পাণ্ডব সৈন্য এবং পশ্চিমদিকে কৌরবসৈন্য ব্যূহবদ্ধ হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বিচিত্র বর্ণের পতাকাসমূহ বাতাসে আন্দোলিত ও হিল্লোলিত হচ্ছে। দুর্যোধনের অনুরোধে পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদে শঙ্খধ্বনি করে যুদ্ধের শুভক্ষণ সূচনা করলেন।

অমনি বিশাল রণাঙ্গন ভরে গেল শঙ্খনাদে, তুরী, ভেরী, দুন্দুভির ধ্বনিতে সৈনিকের কোলাহলে, অস্ত্রের ঝঙ্কারে, অশ্বের হ্রেষারবে, হস্তীর বৃংহণে, রথচক্রের নির্ঘোষে কম্পিত হলো গোটা রণভূমি।

পাঞ্চজন্যে শঙ্খধ্বনি করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ সপ্ত অশ্ববাহিত কপিধ্বজ রথে অর্জুনকে নিয়ে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন নাটকীয়ভাবে। কৃষ্ণ বসে আছেন সারথির আসনে। মুখে তাঁর চটুল হাসি, চোখে কৌতুক। আর রণসাজে সজ্জিত অর্জুন অপরূপ দৃপ্তভঙ্গিতে রথোপরি দাঁড়িয়ে। হাতে গাণ্ডীব, পৃষ্ঠে তূণভর্তি শর। নয়নে সুদূরপ্রসারী অতলস্পর্শী দৃষ্টি। বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্নে বিভোর। দীর্ঘ ক্লেশ, লাঞ্ছনা, বঞ্চনার, যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে এক নতুন জীবনের অভ্যুদয় ঘটাতে অর্জুনের হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। তার বীর হৃদয় নেচে উঠল যুদ্ধের উন্মাদনায়। বলল : সখা, উভয় সেনার মধ্যস্থলে স্থাপন কর আমার রথ। দুরাত্মারা দেখুক আমি অর্জুন। গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয়।

শ্রীকৃষ্ণ আড়চোখে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসলেন এবং উভয়পক্ষের অগণিত সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করলেন। মুহূর্তে রণক্ষেত্রের চেহারাই পাল্টে গেল। স্তব্ধ আতঙ্কে সবাই চেয়ে রইল পার্থসারথির দিকে। কৃষ্ণ অশ্বের লাগাম টেনে ধরেছেন দু'হাতে। কিন্তু অশ্ব বশ মানছে না। তাদের গতি সংহত করতে কৃষ্ণের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। হাতের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠল। অশ্বগুলি হস্তধৃত বল্গার মধ্যে ছটফটিয়ে উঠল। তাদের অস্থিরতা দমন করতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল কৃষ্ণের। রথ নিশ্চল হলে কৃষ্ণ ফিরে তাকালেন সখা পার্থের দিকে।

কৃষ্ণ তো অবাক। অর্জুনের মুখে সেই উৎফুল্ল ভাবও নেই, দীপ্তিও নেই। কেমন একটা বিষাদে ম্রিয়মাণ। হতাশায়, বিষাদে বসে পড়েছে রথের উপর। ব্যাকুলকণ্ঠে বলল : সখা, এ আমি কোথায় এলাম? আমার যাঁরা পরম আত্মীয়, বান্ধব, ভ্রাতা, গুরু, আচার্য, প্রিয় পরিজন তাঁদের সঙ্গে কখনো যুদ্ধ করা যায়? কোন প্রাণে এঁদের উপর অস্ত্রাঘাত করব? যুদ্ধে আমার উৎসাহ নেই আর।

কৃষ্ণের দুই চোখ তিরস্কার এবং ভর্ৎসনা অর্জুনকে বিদ্ধ করল। গাণ্ডীব পরিত্যাগ করে নতজানু হয়ে করজোড়ে আকুল কণ্ঠে বলল : সখা, রক্ষা কর। ভুল করেছি। এই সব অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের রুধিরসিক্ত রাজ্য আমি চাই না। স্বজন হারানোর বেদনার সরোবরে আমি প্রেমের কোন শতদল ফোটাব? স্বজন বধ আমার দ্বারা হবে না। আমি যুদ্ধ করব না।

অর্জুনের দুই চোখে জল। পদ্মপত্রের শিশিরবিন্দুর মতো টলটল করছে। তার কম্পিত আঁখিপল্লব হতাশায় ম্রিয়মাণ। বিষণ্ণতায় কাতর। অর্জুনের দুর্বলতায় আশ্চর্য হলেন কৃষ্ণ। তাঁর ললাটদেশ কুঞ্চিত হলো। চক্ষু বিস্ফারিত হলো। অবশেষে অর্জুনই কী ব্যর্থ করে দেবে তাঁর সব স্বপ্ন, আশা, কল্পনা? স্বর্গ কি হবে না কেনা? দুরাত্মা

দুষ্কৃতকারীদের কবলমুক্ত হবে না ভারতভূমি? ন্যায়ধর্মের হবে না প্রতিষ্ঠা? দুরারোহ দীর্ঘ গিরিপথ অতিক্রম করে অবশেষে গোষ্পদ পারাপারে ব্যর্থ হবেন? সম্মুখে সাফল্যের স্বর্ণচূড়া! আর অল্পমাত্র বাকি! কিন্তু অর্জুনের এ কি ভাবান্তর?

ক্ষুব্ধ বিচলিত নারায়ণ দৃঢ় হস্তে অশ্ববল্গা চেপে ধরতে রথ দুলে উঠল। বসুন্ধরা টলে উঠল। তবু অর্জুনের ভ্রূক্ষেপ নেই। রুষ্ট স্বরে ভর্ৎসনা করে বললেন : সখা, তুমি কী পাগল হলে? তোমার মতো বীরকে এই কাপুরুষতা মানায়?

সখা, আমি তো মানুষ, আমার মন বলে একটা জিনিস আছে। তুমি আমাকে জোর কর না। আমি পারব না। আমি তোমার শরণ নিলাম, তুমি রক্ষা কর আমায়।

অর্জুন, তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ তোমাকে করতে হবে। যাদের পরাক্রমের কথা ভেবে তোমার মনে ভয় জন্মেছে, সেই পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ, ভ্রাতা দুর্যোধন, ভগিনীপতি জয়দ্রথের সঙ্গে তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। যুদ্ধ করতে হবে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্যে। চেয়ে দ্যাখ, হৃতসর্বস্বা, লাঞ্ছিতা, ব্যাথাতুরা ধরণী শিশুর মতো অসহায় দৃষ্টি মেলে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। পরিব্যাপ্ত নিখিলের মধ্যে কী ভীষণ মৌন এবং বিষণ্ণ সে। কে ঘোচাবে তার দুঃখ? একমাত্র তোমার বীর্যবত্তাই পারে ধরণীর জ্বালা জুড়োতে। এ পৃথিবীতে লোভের বঞ্চনা, লাঞ্ছনার জ্বালা, অপমানের বেদনা, অত্যাচারের কষ্ট তোমার আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তাই এ মহারণের তুমি রথী, আমি তোমার সারথি।

তবু অর্জুন নীরব। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণের দিকে। অর্জুনের মনের দুর্বলতার উৎসটা কোথায়, কৃষ্ণ হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ আরো বুঝলেন, অর্জুনের মনের ভয়, দুর্বলতাকে ভর্ৎসনা করে কিংবা রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করে দূর হবে না। অর্জুনের অনুভূতিপ্রবণ মনের অভ্যন্তরে তার বিচারবোধ এবং জ্ঞানকে জাগ্রত না করলে তার এই চিত্তসংকট কিংবা মানসিক বৈকল্য দূর করা যাবে না। অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানে ফিরতে হলে অনেক বাধা, সঙ্কট এবং পথ তাকে অতিক্রম করতে হবে। তবেই এই ভীরু জীবনের অন্ধকার গহ্বর থেকে চিত্ত উন্মেষের আলোকিত প্রান্তরের দিকে সাগরে বয়ে যাওয়া নদীর চলকানো জলের মতোই নির্ভয়ে অফুরন্ত উৎসাহে ধেয়ে যাবে।

কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, ব্রজের কৃষ্ণ হয়ে অর্জুনের তাপিত মনের উপর কোমলতার প্রলেপ দিয়ে মোহগ্রস্ততার অবসাদ থেকে ভারমুক্ত করলেন। গীতায় মহাভারতের কৃষ্ণের বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তার সঙ্গে ব্রজের কৃষ্ণের কোমলতা ও মধুরতার এক আশ্চর্য

মিশ্রণ ঘটেছে। দ্বারকার কৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এক হয়ে গেছেন। মহাকবির এ এক আশ্চর্য সমন্বয়। এই বিস্ময় দেখার জন্যে সেদিন বোধহয় আকাশে সাতটি গ্রহের সমাবেশ ঘটেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সখা ছিলেন। সখার মানসিক বিপর্যয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে কৃষ্ণ তাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। কিন্তু কোনো উপদেশ দেননি। নিদারুণ মানসিক অবসাদে অর্জুন দিশাহারা হয়ে যখন বলল : সখা, আমি আর ভাবতে পারছি না। কর্তব্য-অকর্তব্য স্থির করার মতো মনের অবস্থা নয়। এখন যা করলে ভালো হয়, কর। আমি তোমার শরণাগত। আমাকে তোমার শিষ্য করে নাও।

অর্জুন যখন কৃষ্ণকে গুরু বলে স্বীকার করে নিল এবং তাঁর শিষ্যত্ব মেনে নিল, কৃষ্ণ তখন তাকে গীতোক্ত ধর্ম উপদেশ দিলেন। গুরুশিষ্যের সংলাপের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে অর্জুনের মনের সংশয়, দ্বিধা দূর করে জ্ঞানের দীপ জ্বেলে দিয়েছেন। প্রথমে আত্মার স্বরূপ উন্মোচন করে তাকে সাবধান করে দিলেন। বললেন : অর্জুন রণক্ষেত্রে যখন তুমি প্রবেশ করলে তখন তোমার দম্ভ, আমিত্ব গর্ব আমাকে বিস্মিত করেছে। তোমার দম্ভের প্রতিমূর্তি দুর্যোধন। নিরলস সংগ্রাম ছাড়া সেই অজেয় দুর্যোধনকে তুমি সংহার করতে পারবে না। অহং-এর দাস না হয়ে তুমি আমার হও। আমাকে তোমার সম্পূর্ণ জানা হয়নি বলেই নিজেকে তুমি কর্তা ভাব। কর্তা ঈশ্বর। সোহং আমিই সে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তুমি ভৃত্যের মতো কাজ করছ। তুমি নিজেকে চেনো না বলেই জানতে পারছ না, তোমার রসনা দুঃশাসনের মতো কাজ করছে। রসনা কোনো শাসন মানে না বলে তুমি বাক্যে অসংযত। যে তোমার পতনের কারণ, তাকে সংহার কর। সখা, তোমার চক্ষু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো। সুন্দর দর্শনে বঞ্চিত। সব কিছু অন্ধকারে আবৃত। তোমার কপট বুদ্ধি শকুনি, ক্রূর, লোভাতুর তার দৃষ্টি। তাকে সংহার কর। আত্মা পরিশুদ্ধ না হলে কোনো মহৎ কার্য হয় না। তোমার প্রজ্ঞারূপী ভীষ্মও আজ তোমার বিপক্ষে। তোমার শিক্ষাগুরু দ্রোণও তোমাকে ত্যাগ করে দুর্যোধনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তবু এঁদের সকলকে তোমার প্রিয়জন বলে ভাবছ। অথচ এঁরা সকলে তোমার শত্রু। শত্রু তোমার দেহে মনে, অন্তরে বাইরে। এদের জয় না করা পর্যন্ত চিত্তে নির্মল আনন্দ পাবে না। সখা তোমার ভয় কিসে? তোমার সারথি স্বয়ং ভগবান, তোমর অগ্রজ ধর্মরাজ। তবু তোমার শঙ্কা কেন? এ বিষাদ তোমাকে মানায় না।

ভেতরে ভেতরে অর্জুনের মনে প্রশ্ন জমা হয়। বলল : সখা আমার সব গুলিয়ে

যাচ্ছে। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

আসলে দেহ ও আত্মা সম্পর্কে ধারণা পরিচ্ছন্ন থাকলে তবেই মন বিরোধমুক্ত হয়। যুদ্ধে যাদের তুমি বধ করতে ভয় পাচ্ছ তারাই একই আত্মার স্বরূপ। বিভিন্ন দেহে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। দেহের মৃত্যু হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। মানুষ দেহাতিরিক্ত আত্মা।

সুতরাং দেহের মৃত্যুতে শোকের নেই। আত্মা জীর্ণ বস্ত্রের মতো দেহরূপ আধারকে ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। কেন বুঝছ না, তুমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হলো যুদ্ধ করা। তুমি যুদ্ধ কর। ভয় পেয়ে স্ব-ধর্ম ত্যাগ করলে তোমার অর্জিত কীর্তি, গৌরবের কোনো দাম থাকবে না। কিন্তু যুদ্ধ করে যদি মৃত্যুবরণ কর তাহলেও তুমি অমর হয়ে থাকবে। পৃথিবীতে কর্মই থাকে। কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়। ফলের আশা ত্যাগ করে কামনাহীন নিঃস্বার্থ কর্ম কর।

অর্জুনের মনে প্রশ্ন। দ্বিধা কাটিয়ে বলল : সখা, ফলের জন্যই তো কর্ম করে। যে কর্ম করে ফললাভ হয় না, সে কর্ম করে কী লাভ?

কৃষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টি মেলে অর্জুনের অন্তরটাকে দেখে নিলেন। বললেন : মনের মধ্যে তোমার কর্মের ফললাভের আকাঙ্ক্ষা এতো প্রবল যে যুদ্ধের রন্ধ্রপথ দিয়ে যদি পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ এবং অর্জুন-বিদ্বেষী কর্ণের হাতে তোমার পরাজয় হয়, তোমার অর্জিত বীরত্বের খ্যাতি, গৌরব বিপন্ন হয়ে পড়ে, এই ভয় ও আশঙ্কায় তুমি যুদ্ধে নিরুৎসাহবোধ করছ। নিজের কথা ভেবে তুমি পাণ্ডবদের স্বার্থ বিপন্ন করছ। অর্জুন! পদানত মথুরাকে অত্যাচারী কংস, জরাসন্ধের হাত থেকে উদ্ধার করেছি স্বার্থের কথা চিন্তা না করেই। রাজত্বের লোভ আমি করিনি, রাজপদও গ্রহণ করিনি। নিরাশ্রয়, নির্বান্ধব পাণ্ডবদের পাশে দাঁড়ানোর পেছনেও কোনো স্বার্থ নেই। অধর্ম থেকে ধর্ম রক্ষা করা, অসত্যকে নাশ করাই ঈশ্বেবে কাজ। দুর্গত মানুষের পরিত্রাণে দুষ্কৃতকারীকে দমন করতে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। কর্মফলে আমার আকাঙ্ক্ষা নেই বলে, আমি কর্মে বদ্ধ নই। কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে কর্ম করলে তুমিও সুখী হবে। কুরুক্ষেত্রের কর্মযজ্ঞশালাব হোতা ঈশ্বর। সেই যজ্ঞে তোমার কর্মরূপ অর্ঘ্য আহুতি দাও।

অর্জুন ব্যাকুল হয়ে বলল : সখা, আমার চিত্ত বশে নেই। মন দিয়ে তোমার কথা মেনে নিতে পারছি কৈ? আবার অস্বীকার যে করব সে জোর বা কোথায়? এ আমার হলো কী?

কৃষ্ণ হেসে বললেন : বিষয়াসক্ত মন তো চঞ্চল হবেই। আমি তোমার সখা, অথচ আমাকে তোমার ভালো করে জানা হয়নি। জানতে কখনো চেয়েছ? তমোগুণে তুমি আচ্ছন্ন। তাই মনের চাঞ্চল্য রয়ে গেছে। অশান্ত, অস্থির অশ্বের গতিবেগকে যেমন সবলে লাগাম টেনে তাকে সংযত করেছি, তেমনি মনকেও কঠোরভাবে দমন করে নিজের অধীনে আনতে হয়। এটা ব্যক্তির নিজের ব্যাপার।

সখা, আমি তো তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছি। তবু এমন হচ্ছে কেন?

অর্জুনের আকুলতায় কৃষ্ণ চমকালেন। তার ব্যাকুল বিনম্র দুই আঁখি তারায় কী দেখলেন তিনিই জানেন। তার মনের আঁধার যে অপসারিত হচ্ছে, ঊষার অরুণোদয়ের আয়োজন চলছে সেখানে এবং শীঘ্রই ঘন কুহেলীজাল অপসারিত করে সূর্যোদয় হবে এটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না। দু'চোখে বিস্ময়ের দীপ জ্বেলে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে গাঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন : পার্থ! বায়ুর মতো প্রচ্ছন্ন এবং নির্লিপ্ত বলেই আমার জগৎময় অস্তিত্ব তুমি টের পাও না। সমস্ত ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ আমাতে অবস্থিত। এই বিশ্বাসে মন দৃঢ় হচ্ছে না বলেই মনের মাটিতে পা রাখতে পারছ না। সংশয়, ভয় ত্যাগ করে নির্ভয়ে এবং বিশ্বাসে মনপ্রাণ আমাতে সমর্পণ কর। আমাকে দিয়ে থুয়ে তুমি নিঃস্ব রিক্ত হলে দেখবে মনেতে কোনো যন্ত্রণা নেই, অস্থিরতা নেই।

অবচেতনের গভীর থেকে উঠে আসা একটা তীব্র স্বস্তি অসহায়ে উচ্চারণ করল : সখা, এমন করে কোনোদিন তুমি মেলে ধরনি নিজেকে। এক বিশেষ সঙ্কটে জানলাম, তুমি অনন্ত, অসীম। তোমার ব্যাপ্তি ও বিরাটত্ব যে তোমার দেহের চৌহদ্দিতে ধরে না, কেমন করে বুঝব? আমার সংশয় দূর করার জন্যে তোমার সেই অব্যক্ত, অনির্বচনীয় আত্মরূপ দর্শন করাও।

এক দারুণ দীপ্তিতে কৃষ্ণের মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। অর্জুনের দু'চোখে সাধকোচিত ধ্যানদৃষ্টি। কৃষ্ণ তার আঁখি তারার দিকে চেয়ে বললেন : এই বিশ্বজগৎ প্রত্যেকের মনের ব্রহ্মাণ্ডে আছে। অনন্তকাল ধরে জন্ম-জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে সে চলেছে অনন্তের অভিমুখে। তুমি, আমি বহুবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু মায়াপ্রভাবে তুমি সব ভুলে আছ, কিন্তু আমি কিছুই ভুলিনি। এ সব তো নর্মচোখে দেখার জিনিস নয় সখা। কেবল ধ্যানযোগে মনের অভ্যন্তরে তাকে অনুধ্যান করা যায়, তার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

অর্জুনের সহসা ভাবান্তর হলো। একটা অদ্ভুত ভাব জন্মাল। ভক্ত ও ভগবানের সাযুজ্য ঘটল। কৃষ্ণের দিকে চোখ তুলে তাকাতে মনে হলো সে কৃষ্ণকে দেখছিল না,

কৃষ্ণের মধ্যে এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখছিল। তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছিল। আরো দেখল কোটি কোটি গ্রহ, নক্ষত্র, তারার সমাবেশ। সেই বিরাটের প্রদীপ্ত অনেক বর্ণ বিস্ফারিত মুখমণ্ডল এবং উজ্জ্বল নয়ন দেখে তার চিত্ত সন্ত্রস্ত হলো।

করজোড় করে অর্জুন আত্মনিবেদনের ভাষায় বলল : হে বিশ্বেশ্বর, তোমার এই বিরাট রূপ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি জানতাম না তুমি এত বিরাট। তোমার বিরাটত্ব আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে। আমার হৃদয় উন্মোচিত হয়েছে। আমাকে তুমি ক্ষমা কর সখা। তোমার এই ভয়ঙ্কর রূপ আমি দেখতে চাই না। আমার প্রিয় তোমার চতুর্ভুজরূপে, শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধারী নারায়ণরূপে আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হও।

প্রাশান্ত মধুর হাস্যে শ্যামবদন উদ্ভাসিত হলো। অর্জুনের মনে হলো, বহু দূর থেকে শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাধারী বিষ্ণুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল তার কর্ণকুহরে। আমি লোকসংহারে প্রবৃত্ত মহাকাল। আমি দুষ্টের দমনকারী, শিষ্টের পালক। তুমি যুদ্ধ না করলেও বিপক্ষ দলের বীরেরা কেউ জীবিত থাকবে না। তুমি যুদ্ধ কর। ভয় পেয়ো না, যুদ্ধজয়ে সন্দিহান হয়ো না। যুদ্ধার্থে তুমি প্রস্তুত হও এবং যশস্বী হও।

আত্মমগ্নতার জগৎ থেকে অর্জুন চৈতন্যে ফিরল। তার ভেতর দুরন্ত সাহস, তেজ, বল অনুভব করল। ভেতরটা উদ্দীপ্ত হলো। খুশির তরঙ্গ বয়ে গেল সারা অঙ্গে। অর্জুনের মুখে অন্তর্হিত দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য তার মুখচোখের ভাব বদলে দিল। যোগস্থ ভক্ত ধীরে ধীরে চোখ মেলে অনন্ত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে ভগবানের দিকে। যেন কোন সুদূরের পার হতে অর্জুন ফিরে এলো মর্ত্যলোকে। খুশি খুশি চোখ মেলে কৃষ্ণ তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে আপ্লুত হলো অর্জুনের অন্তঃকরণ। গদগদ কণ্ঠে বলল : প্রভু আমার! প্রিয় আমার! কী মধুর, কী সুন্দর তোমার এই মানবমূর্তি। আমার আর কোনো কর্তৃত্বাভিমান নেই, কোনো কিছুতে মোহ নেই, এখন আমি তোমার শুধু।

স্বকর্মে স্বধর্মে উদ্বুদ্ধ অর্জুন গাণ্ডীব হস্তে ঘুরে দাঁড়াল কুরুক্ষেত্রের দিকে। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরজ্জু ধরলেন। অমনি ধমনীর মধ্যে শিহরন জাগল অর্জুনের। সুগঠিত মাংসপেশীতে লাগল যুদ্ধোন্মাদনার অস্থিরতা।

শুরু হলো কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ!

অভিসার

সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসছে চারদিক থেকে। রাস্তার দু'ধারে গাছগুলির বাস্তবতা হারিয়ে যাচ্ছে এক রহস্যময় কুহেলিকায়। স্নান সেরে ধীর পায়ে বাসবদত্তা উঠে এল কল্লোলিত ঝরনার বুক থেকে। ভেজা কাপড় তার অঙ্গের সঙ্গে এমনই সেঁটে ছিল যে বিশ বছরের উদ্দাম যৌবনের সব চিহ্নগুলি আবরণ ভেদ করে ফুটে বেরোচ্ছিল। ঝরনার বুক থেকে বনজ গন্ধ বয়ে নিয়ে ফুরেফুরে হাওয়া ছুটে এল তার পিছু পিছু। প্রেমপিপাসু নাগরের মত কানে কানে স্তুতি করে বার বার অস্ফুটস্বরে বলছিল যেন; বাসবদত্তা কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে! ঝরনার স্বচ্ছ জল, মৌনগম্ভীর পর্বতের শুভ্র তুষার, দিগন্তের নীলাভ ছায়ায় ঢাকা পর্বতমালা, সবুজ বনানী, আকাশের

অফুরন্ত আলো এই সব দিয়ে বিধাতা তিল তিল করে তিলোত্তমার মত গড়েছে তোমার দেহশ্রী। তুমি ভীষণ সুন্দরী। মনের অভ্যন্তরে কথাগুলো তার বুকের ভেতর তীব্র খুশির কলধ্বনি হয়ে বাজতে লাগল। ঝরনার কলতান, বাতাসের ফিসফিসানি, দু'পাশে সারিবদ্ধ গাছের বিস্ময়, গাছের ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে দেখা চাঁদের লোভী দৃষ্টি তার ভেতর রূপসচেতন নগরনটীর ফুরিয়ে যাওয়া জীবনকে নবীকৃত করে। রোজই ঝরনার জলে স্নান করে সে নতুন হয়ে ওঠে। নতুন করে প্রাণ পায়।

দর্শনের সামনে বসে অনেকক্ষণ ধরে সাজল বাসবদত্তা। প্রস্ফুটিত ফুলের মত তরতাজা যৌবনকে বিপুল ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অপলক দুই চোখে মুগ্ধ তন্ময়তা নেমে আসে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিজেকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ইস্ বাসবদত্তা তোমার হাত-পা কী নিটোল, কী সন্দুর! ননীর মত নরম, মোমের মত মসৃণ তোমার ত্বক। কচি শিশুর মত নরম তুলতুলে হাত দিয়ে তার সুডৌল বুকটা স্পর্শ করে বিচিত্র এক শিহরনে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর। হঠাৎই মন পড়ে যায় মার কথা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে মা নাকি স্বপ্ন দেখেছিল সে রাণী হয়ে পৃথিবী শাসন করবে। বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে দু'হাত দিয়ে দান করবে। মার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়লে ভীষণ হাসি পায় তার। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

চোখের সামনে সুদূর অতীতের কত ছবি ভেসে ওঠে। অভাব অনটনের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে বাপ-মায়ের কথাবার্তা হয়ে গিয়েছিল রুক্ষ, কর্কশ। প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতার পাত্র শুকিয়ে গিয়েছিল। কোথাও করুণার আভাস ছিল না। জীবনটাই তাদের ফুরিয়ে গেছিল। তবু হাঁ করা অভাবের সংসারে ভাঙা নড়বড়ে ঘরের ঝাঝরা চালের নিচে মাটিতে শুয়ে মায়েরা ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখে। দুঃখী মানুষের এ ধরনের স্বপ্ন বিলাস তার অফুরান কষ্টের মধ্যে একটুকরো সুখ হয়ে বেঁচে থাকার শক্তি দেয়। সেই ছোট্ট, তৃপ্তি শান্তিটুকু ছিনিয়ে নেয় রাজার লোকেরা। রাজস্ব আদায়ের নাম করে সর্বস্ব অপরহণ করে তাদের। ঘরে সুন্দরী মেয়ে, বৌ থাকলে বাজপাখির মত ছোঁ মেরে তাদের ছোট্ট সুখকে ধারাল ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে ভাগাড়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত দুটো পা দিয়ে চেপে ধরে তাকে ছিন্নভিন্ন করে। অমনি এক জ্বালা-ধরা ক্রোধে ঘৃণায় মনটা পুড়তে থাকে।

খুট্ খুট্ করে জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দ হতে লাগল। আগন্তুক দরজা না খোলা পর্যন্ত কড়া নাড়িয়েই যাচ্ছিল। বাসবদত্তা সাড়া না দিয়ে চুপি চুপি দরজা খুলে দিল।

ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল বজ্রসেন। ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে দ্রুত হাতে কপাট বন্ধ করে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। মনে হল অনেকখানি পথ দৌড়ে এসে হাঁপিয়ে পড়েছে। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। বাসবদত্তা তার এই অস্বাভাবিকতায় বেশ একটু অবাক হয়ে অপলক চেয়ে রইল। বজ্রসেনও অসহায়ের মত জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে কিছু বলার চেষ্টা করছিল।

বজ্রসেনকে হাত ধরে বাসবদত্তা তার পালঙ্কে বসাল। হাত পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল : কী হয়েছে তোমার? এত হাঁপাচ্ছ কেন?

বজ্রসেন বাসবদত্তার কোমর জড়িয়ে ধরে তার বুকের কাছে মাথা রাখল। চন্দন অগরু লেপিত সুবাসিত অঙ্গের ঘ্রাণ নিল বুক ভরে। তারপর তাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে কোলের ওপর বসিয়ে বলল : আমার ভাগ্য খুলেছে। এই সুসংবাদটা দিতে দৌড়ে এলাম। পাছে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজে লোক জানাজানি হয় তাই খালি পায়ে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছি। বাসবদত্তা, আজ থেকে তুমি শুধু আমার।

বাসবদত্তা তার বাহুবন্ধনে বন্দী হয়ে চটুল হেসে বলল : কিন্তু তুমি কি আমার হয়েছ?

উত্তেজিত গলায় দৃঢ়তার সঙ্গে বজ্রসেন তৎক্ষণাৎ বলল : আলবাৎ।

চোখের তারায় বিদ্যুৎ কটাক্ষ হেসে বলল : কেমন করে জানলে?

বজ্রসেনের ভেতরটা হঠাই খুশিতে ভরপুর হয়ে গেল। বলল : জান বাসবদত্তা বৈশালী নাটমন্দিরে আজ এক নতুন মেয়ের নাচ দেখে এলাম। উতরোল বাদ্যযন্ত্রের সুরের মূর্ছনায় নাটমঞ্চ যখন গমগম করছে মরালীর মত এক লাবণ্যময়ী তরুণী সুরের ভেলায় ভেসে এল যেন। কী দারুণ দেখতে! ফিনফিনে শুভ্র উত্তরীয়টি খুলে ফেলে দিল। স্বপ্নের মত নীলাভ পোশাকের আড়ালে রূপসী নর্তকীর ক্ষীণ তনু তুষারশুভ্র অবয়ব গোটা নৃত্যস্থলীতে নদীর মত তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। সে যখন নাচছিল তার যৌবনপুষ্ট স্বল্পবাস তন্বীদেহের লীলায়িত বিন্যাসে বিচিত্র মুদ্রা রচনা করে নাচতে লাগল। তার নাচে কেমন একটা আদিমতা ছিল। নাচছিল পাগলের মত। চক্রাকারে পাক খেয়ে খেয়ে লম্বা বেণীর এক দুরন্ত ঘূর্ণি সৃষ্টি করে, দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছিল। তার রঙিন বক্ষবাসের আড়ালে আন্দোলিত দুটি সুডৌল পয়োধর। নিতম্বের সর্পিল তরঙ্গময় ওঠানামা বৈশালী যুবরাজ চন্দ্রকান্তকে হঠাৎই প্রমত্ত আবেগে অসহিষ্ণু করে তুলল হঠাৎই নটী নাচের বেগে যুবরাজের পদতলে লুটিয়ে পড়ল। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় যুবরাজ পদতল থেকে তাকে দু'হাতে তুলে ধরল তার মুখের

সামনে। বলল : কী সুন্দর তোমার নাচ। লোকলোকান্ত পেরিয়ে আমাকে এক অজানা চিত্তরহস্যময় জগতে নিয়ে গেছ তুমি। কথা শেষ করে তার গলায় পরিয়ে দিল নিজের গলার হীরে-মোতির মালা।

বাসবদত্তার বুকের ভেতরটা গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। তবু নিজেকে সে শান্ত এবং সংযত রাখল। একটুও কাতরতা নেই তার মধ্যে। বজ্রসেনের কথাগুলো সে উপভোগ করছিল। চোখের তারায় বিদ্যুৎ খেলা করছিল। মাঝে মাঝে হাঁ-হুঁ করে সায়ও দিয়ে যাচ্ছিল। হাসলও আবার। মোহন হাসি। বলল : মনটা দর্পণের মত। নানা প্রতিবিম্ব পড়ে তার ওপর। দর্পণের মত সব কিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে যে না শেখে, সে নানাবিধ ঘটনার মধ্যে নিজেও বাঁচতে পারে না। যা সত্য তাকে সহজভাবে মেনে নিলে জীবনে কোন বিরোধ থাকে না। প্রত্যেকের ভেতর যে মাধুরীলতা আছে তার ফুল ফুটলে আপনা থেকে তার সৌরভ ছড়িয়ে যাবে।

বজ্রসেন খুশিতে ভরপুর হয়ে বাসবদত্তাকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে তার মাথার উপর চিবুক রেখে আদর করে খুব করল। চোখের ওপর চোখ রেখে রেখে বাসবদত্তা বলল : বজ্রসেন তুমি তো আমার হয়ে গেছ, কিন্তু আমি তোমার হয়েছি কি না জানতে চাইলে না তো।

বাসবদত্তার গালের ওপর একটা ছোট্ট করে টোকা দিয়ে বলল : এই মুহূর্তে তোমার কৌতুক শুনতে ভাল লাগছে। আচ্ছা এই যে আগুনের মত উত্তাপ লাগছে আমার গায় এটাকে কী বলবে তুমি! এটাই তো ভালবাসা। আমার সর্বাঙ্গে তোমাকে অনুভব করছি তুমিও আমার নীরব স্পর্শ গায়ে মেখে চুপ করে বসে আছো, কেন?

বজ্রসেন রঙিন কথার ফুলঝুরি জ্বেলে একটু একটু করে অব্যর্থ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিপুণ হাতে দ্রুত খুলে ফেলল তার কাঁচুলি. ঘাঘরা। বাসবদত্তা একটুও আপত্তি করল না, যে মুহূর্তে নিরাবরণ দেহলতাটি মত্ত উল্লাসে সম্ভোগে মেতে ওঠার জন্য তাকে বেষ্টন করল অমনি সে দূরে সরে গিয়ে বলল : বজ্রসেন! নগ্নিকা কালীমূর্তি দেখেও কি তোমার মনে কামনার আগুন জ্বলে ওঠে? ছিঃ! ঝাড়বাতির আলোয় উজ্জ্বল তার নগ্নদেহের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের দিকে ইঙ্গিত করে প্রশান্ত কণ্ঠে বলল : বিধাতার দান এই নারীদেহের রূপলাবণ্য, শুধু ভোগ করার জন্য উন্মত্ত না হয়ে শ্রদ্ধা করতে শেখ বজ্রসেন।

বজ্রসেনের ভেতর উন্মাদ পশুটা হঠাৎই পাথুরে মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল। তার ভেতরে কামনার আগুন নিভে গেল। চোখে ফুটে উঠল বিস্ময়।

বাসবদত্তা অভিভূত গলায় বলল : কি দেখছ বজ্রসেন! আমাকে না নিজেকে? আমি দেবদাসী। একদিন ঐ নাচনীর মত দেবতার মনোরঞ্জন করতে এসে চন্দ্রকান্তর বাঞ্ছিতা হয়ে যাই। তাকে ছাড়া আর কোনো পুরুষকে এদেহের ভাগ দিতে পারব না। তুমি তার বন্ধু, বন্ধুর বিশ্বাসভঙ্গ করে আমার কাছে কোনদিন এস না।

বজ্রসেন আর একটা মুহূর্ত থাকেনি বাসবদত্তার ঘরে। মাথা নিচু করে চলে গেল।

বজ্রসেনের সঙ্গে এরকম অদ্ভুত আচরণে সে একটু অবাকই হল। শুরু হল আত্মবিশ্লেষণ। জীবনে কত ধরনের মানুষ এসেছে গেছে, তাদের প্রত্যেককেই সে চরিতার্থ করেছে। অদ্যাবধি কাউকে প্রত্যাখ্যান করেনি। এক শয্যায় রাতের পর রাত কাটিয়েছে তাদের পাশে শুয়ে, কখনও দ্বিধা করেনি কিছুতে। যে যখন আমন্ত্রণ করে একান্ত পেতে চেয়েছে ; দেহের নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছে তাকে। এ ব্যাপারে অদ্যাবধি ক্লান্তি আসিনি। নাগরকে তুষ্ট করাই তার ধর্ম। কারণ তারা তো সুখ-আনন্দ কিনতে আসে। দোকানীর মত সে তা বিক্রি করে। কিন্তু বজ্রসেনের সঙ্গে যে রূঢ় আচরণ আজ সে করল তা নিতান্তই আকস্মিক এক অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা। জীবনে এরকম আচরণ তার একেবারে নতুন এবং বিস্ময়কর। বজ্রসেনের সারা শরীর যখন মিলনের আনন্দে শাঁখের সুরের মত বেজে যাচ্ছিল, খুশিহীন জীবনটা, খুশিতে ভরপুর করে নিতে তার বুকে নদী হয়ে মিশে যেতে চাইল, ঠিক তখুনি সুরত ক্লান্ত রমণীর মত বিরক্তিকে ছিটকে গেল তার কাছে থেকে। যা সস্তা ছিল সেই শরীরটাকেই দামী মনে করে দারুণ তাচ্ছিল্য করল তাকে। বজ্রসেনের সঙ্গে এরকম অদ্ভুত আচরণে সে একটু অবাকই হল। বজ্রসেনও প্রত্যাখ্যাত হয়ে বর্বর হয়ে উঠল না। জোর করল না তার ওপর। হঠাৎ এমন উপেক্ষার জন্য রাগ করতে পারত। সবেগে জাপ্টে ধরে খামচা-খামচি করে তাকে কব্জা করতে তো পারত। কিন্তু সে কিছুই করল না। তার এই অদ্ভুত ঠাণ্ডা পুরুষ প্রকৃতিটা ভিতরে ভিতরে ভীষণ এক যন্ত্রণা দেয় তাকে প্রতিকারহীন যন্ত্রণা। শরীর ছাড়াও একজন পুরষকে যে একজন নারীর দেওয়ার মত অনেক কিছু আছে। বেশিরভাগ পুরুষ তা নিতে জানে না। পুরুষ শুধু জংলী উদ্দামতায় মেতে ওঠে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। তাই বোধ হয় তীব্র অভিমানে তার ভেতর জমে ওঠা বিরূপতাই বজ্রসেনের ওপর উগরে দিয়েছিল। তার প্রশ্রয় ভরা তিরস্কারের মধ্যে একরকমের চাপা নিষ্ঠুর কৌতুক ছিল। আর সেই কৌতুকের সঙ্গে মিশে ছিল এক ধরনের অপ্রকাশ্য আতঙ্ক মেশা আনন্দও। কিন্তু সেখান থেকে আনন্দ নিয়ে ফেরার কথা ছিল সেখান থেকে নিরানন্দ হয়ে শূন্য হাতে ফিরতে হল তাকে। এসব আনন্দকর

অনুভূতির নাম জানে না বাসবদত্তা। নটীর জীবনে এ অনুভূতিও একেবারে নতুন।

নটীর মন বলে কিছু থাকতে নেই। কারণ নটী নিজের আনন্দের জন্য সুখের জন্য বাঁচে না। নাগরের আনন্দ, স্ফূর্তি, সুখ, আরামের জন্যই বাঁচে। তার নিজের জীবনটা নৈবেদ্যের ফুল-বেলপাতার তলায় চাপা পড়ে যায়। স্তূপাকৃতি সেই জঞ্জালের পাঁকে পদ্ম ফোটাতে চাইলেও ফোটে না। দৈবাৎ হৃৎকমলের চারাগাছ যদি চোখের আড়ালে অঙ্কুরিত হয় তাহলে কামনার এমন হঠাৎ মৃত্যু ঘটে কি সেখানে? নটীর সুরত ক্লান্ত হওয়া মানেই তো তার মৃত্যু। এমন হঠাৎ মৃত্যু সে এর আগে কখনও নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেনি। এহল পরাজয়ের সূচনা। তবে কি ফুরিয়ে গেল সে। ভেতরে ভেতরে সে আতঙ্কিত হল। নিজেকেই প্রবোধ দিয়ে নিরুচ্চারে প্রবোধ দিল। না এ হতে পারে না। হয় না। হলেও বাঁচবে না সে।

দর্পণের সামনে এসে দাড়াল বাসবদত্তা। নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্নভাবে দেখল। মুকুরে মুকুরে তার আশ্চর্য দেহকান্তির সতেজ অঙ্গের অনাবৃত যে অংশের প্রতিবিম্ব ফুটে বেরোচ্ছে তার কমনীয় লাবণ্যপ্রভা তাকে জানিয়ে দিয়ে দিচ্ছে এখনও বয়সের ছাপ পড়েনি কোথাও। নিটোল শরীরে কোথাও এতটুকু খাঁজ পড়েনি কিংবা টোল খায়নি। এখনও তার দেহ অনন্ত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। এখনও তৃষ্ণা মেটানো এবং নাগরের আনন্দিত হওয়ার অনেক কিছুই আছে তার শরীরে। কিছুই ফুরিয়ে যায়নি তার।

বাসবদত্তার কিচ্ছু ভাল লাগছিল না। থেকে থেকে চন্দ্রকান্তর কথাই মনে হচ্ছিল। চন্দ্রকান্ত মথুরাপুরের রাজার বখে যাওয়া ছেলে। তাকে সুস্থ জীবনস্রোতে ফেরানোর জন্যই তার মত একজন সুন্দরী মেয়েকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। অনেকটা পুজোর জন্য পাঁঠা উৎসর্গের মত। তব কথাটা মনে হলে লজ্জা হওয়ার বদলে গর্ব হয়। এত তো মেয়ে আছে পৃথিবীময়, তবু তাদের কাউকে নয়, চন্দ্রকান্তর জন্য শুধু তাকেই চাই। তার মধ্যে মথুরাপুরের রাজা প্রসেনজিৎ কী দেখলেন তিনিই জানেন। এটা কি কম কথা!

চন্দ্রকান্ত ইদানীং সুরা প্রায় ছোঁয় না। বাস্তবিক যাদের নেশা থাকে তারা না খেয়ে পারে না। কিন্তু চন্দ্রকান্ত একদম না খেয়েও থাকতে পারে দিনের পর দিন। হয়ত এটা ওর সত্যিকারের নেশা ছিল না। আসলে সে নিজের মত হতে চেয়েছিল। সেই হতে না পারার বিদ্রোহটা তাকে বিনাশের পথে নিয়ে গেছিল। বাসবদত্তা বুঝেছিল সে চায় একটা আলাদা সম্মান এবং স্বীকৃতি যা তার বাপের কাছ থেকে পাওয়া নয়। তার

একেবারে নিজস্ব। বাসবদত্তা তাকে গান ও নাচ শেখায়। সময়টা তার সঙ্গে নাচ ও গানের মধ্যে কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরও পায় না। তবু এই মানুষটার ওপরে তার কোন অধিকার নেই, দাবি নেই। তার শুধু দেবার আছে, নেবার কিছু নেই। নিজের অজান্তে তার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মাথার মধ্যে অদ্ভুত একটা বোবা ভাব। সব ভাবনা চিন্তা থেমে গেছে। কথা খেলছে না। অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করছিল। রাগে, ঈর্ষায় তার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল।

বজ্রসেনের কাছে নটীর কথাটা শোনা থেকেই কেবলই মনে হচ্ছিল বিশাল একটা ঢেউ বুঝি তাকে নিস্পিষ্ট করে দেবে। ঘরদোর ভাসিয়ে দেবে। যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎই মনে হলে সর্ষে-দানার মত পায়ের তলা থেকে কুলকুল করে তা সরে যাচ্ছে। চলন্ত বালির ওপর সে কিছুতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

এইরকম একটা মনের সংকটময় মুহূর্তে চন্দ্রকান্তকে চোখের দেখা দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা যে কতখানি বাসবদত্তা তীব্রভাবে অনুভব করল। তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তার ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠল। সে আর অপেক্ষা করতে পারছিল না। অতি স্পর্শকাতর মনটাই তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছিল। তার অন্তরের তার সব যন্ত্রণার গভীর থেকে উৎসারিত হল : চন্দ্রকান্ত ; আমার চন্দ্রকান্ত! তুমি নিষ্ঠুর হয়ো না। বড় ভয়ে ভয়ে থাকি। সব সময় হারানোর ভয়, না পাওয়ার ভয় আমার মনটাকে আর্ত করে রাখে।

নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো বাসবদত্তা আবার ব্যাকুল কণ্ঠে বলল : চন্দ্রকান্ত -- অ। তুমি কি সত্যিই হারিয়ে যাবে বাসবদত্তার জীবন থেকে। তুমি গেলে বাসবদত্তা আর বাঁচবে না। কী নিয়ে থাকবে, কার সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটাবে?

রাত এখন নিঝুম। আকাশ ভরা নক্ষত্র। দেবতা লক্ষ লক্ষ চোখ হয়ে জ্বলছে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় বন পাহাড় সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দূরে কোথাও মাদল বাজছে। মাদলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বনের মানুষরা মেয়েদের কোমর জড়িয়ে গান গাইছে, নৃত্য করছে। গাছের মগডালে বসে থাকা একটা বনময়ূর চাঁদে রাঙানো বন, পাহাড়, নীল আকাশকে চমকে দিয়ে কর্কশ গলায় কেঁয়াকেঁয়া করে ডেকে উঠল। মৌন রাতের স্নিগ্ধ শান্তি ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেল তার হর্ষে। কোথা থেকে ছাইরঙা মেঘ উড়ে এসে চাঁদের কাছে পরতে পরতে জমতে লাগল। বিষাদের ছায়া নামল গাছগাছালির মাথায় মাথায়।

ঘরে মন বসল না বাসবদত্তার। মুক্তির জন্য ছটফটিয়ে উঠল তার ভেতরটা। চাঁদের

আলোয় ভেসে যাওয়া চরাচর, বন-পাহাড়, নাচের গান, ময়ূরের ডাক, চমকানো রাত, ভয় পাওয়া গাছের ফিসফিসানি, বুনো ফুলের গন্ধ, মহুয়ার মাতাল বাতাসে আধো আলো, আধো ছায়ায় রহস্যে ভরা রাত তাকে ঘর থেকে ডেকে নিল। এমন মায়াবী রাতেই তার আজকের অভিসার। বাসবদত্তার মন বলছিল, প্রমোদ কাননে চন্দ্রকান্ত তার অপেক্ষায় ঘর বার করছে। দাসীর দীপ ধরার তর সইল না। ভেতরটা তার মহুয়ার মাতাল বাতাসের মতই আকুল হয়ে উঠেছিল! দুয়ার হাট করে খুলে রেখে সে একা একাই মথুরাপুরীর প্রমোদ কাননের দিকে নূপুরের ঝমক ঝমক শব্দে রাতকে চমকে দিয়ে বনভূমিকে সচকিত করে, চাঁদের আলো গায়ে মেখে, মৃদু মন্থর বাতাসের বিলম্বিত ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মরালের মত উড়ে চলল মহৎ ও উদার অনুভূতির রাজ্যে।

আশ্চর্য একটা আত্মপ্রসাদে আবিষ্ট হয়ে গেছে তার মন। আর সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল তার স্বপ্নের রাজপুত্র চন্দ্রকান্তর উজ্জ্বল চাঁদের মত স্নিগ্ধ মুখশ্রী। আকাশ বাতাস দিক্‌দিগন্ত আলোড়িত করে মধুপগুঞ্জনের মত কানের মধ্যে বাজছিল তার শান্ত, স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর। বাসবদত্তা! আমি স্বর্গ চিনি না। এই পৃথিবীটাই মানুষের ভালবাসার স্বর্গ হয়ে যায়। স্বর্গ শুধু সুখের জন্য। দুঃখও যে মানুষকে অসাধারণ সুন্দর করে, স্বর্গের দেবতারা তা জানে না। তাই একটু বিচ্যুতি ঘটলেই অভিশাপ দেন। অর্থাৎ অনন্ত দুঃখভোগের যন্ত্রণা এবং পরিতাপের আগুনে পুড়ে পুড়ে তাকে খাঁটি হতে হয়। দেবতাদের অভিশাপ হল শুধরে নেয়ার এক ধরনের শাস্তি। এই শাস্তিটুকুও যে কত সুন্দর, কত প্রয়োজন তা দুঃখের মধ্যে নিজেকে না নিয়ে এলে অনুভব করা যায় না। জীবনও বোধ বা পূর্ণ হয় না। আমার আগের জীবন আর এই এখনকার জীবনযাপনের মধ্যে দুটো মস্ত বড় ভাগ। তুমিই আমাকে সেটা অনুভব করতে শিখিয়েছ। তোমার কাছে আমার এ্ঋণ কোনদিন ফুরোবে না।

চন্দ্রকান্তর মুখে নিজের স্তুতি শোনার পর বিশেষ আনন্দে বাসবদত্তার ভেতরটা ভরে যাচ্ছিল। নীল সাগরের মত তার গভীর দুই চোখের ওপর চোখ রেখে তার গালের ওপর নিজের গাল রেখে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে বাসবদত্তা বলেছিল প্রত্যেক মানুষকে ভগবান আলাদা আলাদা ভাবার মত মন দিয়েছেন বলেই মানুষ সেটা নিজের কাজে লাগায়। কিন্তু যাকে কলুর বলদের মত চোখ ঢেকে ঘানি ঘুরিয়ে সারা জীবন পিষে তেল বের করতে হয় তার কাছে কিন্তু স্বর্গ অনেক দামি। পৃথিবীর অন্য কিছু নয়, স্বর্গের সুখই চায়।

তুমি কি স্বর্গসুখের অভিলাষী? চন্দ্রকান্ত একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল তাকে।

সব মানুষই চায় সুখে থাকতে। আনন্দ, বিলাস, বৈভব কার না ভাল লাগে? সাধ করে দুঃখে থাকতে চায় কে?

বিপুল ভোগ সুখে মশগুল থাকার নামই স্বর্গসুখ। এই সুখের জন্য স্বর্গে যেতে হয় না। এই মর্তলোকেই সেই স্বর্গ তৈরি করে মানুষ শান্তি, আরাম, সুখ খুঁজেছিল। কিন্তু একদিন তাতে ক্লান্তি এল। তখন সে নিজেই বিদ্রোহ করল নিজের বিরুদ্ধে। সুখ, আরাম, বিলাসের মধ্যে প্রেম মরে যায়, ভালবাসা শুকিয়ে যায়, মমতার অমৃতটুকুও নিজের অজান্তে গলাধঃকরণ করেছে। আমার নিজের জীবন দিয়ে তা অনুভব করেছি। তোমার মত দুঃখী মর্ত মানবীর বুকে ভালবাসার সুধা আছে এই বোধ, অনুভূতি স্বর্গের মানুষের বুকে জন্মায় না। মর্তের দুঃখী মানুষের বুকে জন্মায় বলেই এখানে সব অনিত্য! প্রতিমুহূর্ত হারানোর ভয় থাকে বলেই ভীষণভাবে আঁকড়ে ধরে সার্থক হয়ে উঠতে চায়।

মর্তের জীবন বড় একঘেয়ে। দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকতে থাকতে একধরনের ভয় আমাকে ব্যাকুল করে। অভিশপ্ত দুঃখের জীবন থেকে মুক্ত হয়ে কবে যে স্বর্গ সুখে ফিরব, কিংবা আদৌ এজীবনে তার স্বাদ পাব কি না — কে জানে?

চন্দ্রকান্ত দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে বাসবদত্তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। বলল : আশ্চর্য! মর্তের সব অমৃতটুকু আমাকে দিয়ে তুমি নতুন জীবন দিয়েছ, আর তুমি তার গরলটুকু নীলকণ্ঠের মত একা গলাধ করণ করে বিষের জ্বালায় ছটফট করছ। বাসবদত্তা আমার স্বর্গসুখের সঙ্গে তোমার মর্তের দুঃখ বিনিময় করে নেবে? তোমাকে না পেলে আমার জানা হত না মর্ত কত সুন্দর। প্রেম, ভালবাসা, মমতা, দয়া, করুণা শুধু মর্তেই আছে। শস্যের মত মর্তের মাটিতে ভালবাসা জন্মায়।

কি জানি? তোমার জীবন তোমার, আমার জীবন আমার। যার যার জীবনের ভারে চাপা পড়ে আছি।

তোমার জীবনে অনেক পুরুষ এসেছে, তারা তোমাকে ভালবেসে নতুন হয়ে উঠেছে। তোমার মনও রঙিন হয়েছে। তবু তুমি এত রিক্ত কেন? তোমার মন বলে সত্যি কিছু নেই? সত্যিই তুমি স্বর্গেরই যোগ্য।

এসব কথায় সে এতই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে পথের ওপর তার নজর ছিল না। আনমনে হাঁটছিল। মথুরাপুরের প্রমোদ কাননের প্রাচীরের ধার দিয়ে চলার সময় হঠাৎই হোঁচট খেল। রীতের নীরবতা ভঙ্গ করে সব নূপুরগুলো একসঙ্গে বেতাল

বেজে উঠল। মুহূর্তে একটা বিরাট বিশৃঙ্খল ঘটে গেল গেল। বাসবদত্তা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যেতে যেতে কোনও মতে সামনে নিল। অন্যমনস্কতার জগৎ থেকে বাস্তবে প্রত্যাবর্তন করে সে অনুভব করল মাটিতে শায়িত কোনো ঘুমন্ত মানুষের গায়ে না দেখে পা দিয়ে ফেলেছে। সেই ধাক্কায় লোকটিও ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল। বেশ একটু বিব্রত এবং ব্যস্ত হয়ে উৎকণ্ঠিত গলায় ব্যাকুল হয়ে বলল : আহা। বড্ড লেগেছে তাই না! সত্যি আমি কি যেন। গোটা পথটা জুড়ে শুয়ে আছি।

শুভ্র চাঁদের আলোয় বাসবদত্তা দেখল মুণ্ডিতমস্তক এক সন্ন্যাসী তার শান্ত, সৌম্য শ্রীময় মুখের ওপর চাঁদের আলো পড়ে অপূর্ব লাগছিল তাকে। মনে হল তার শুভ্রগায়ে আকাশ থেকে এক অপার্থিব আলো এসে পড়েছে। দিকপ্লাবী জ্যোৎস্নার আলোর প্রাঙ্গণের মাঝখানে যেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে স্বর্গলোকের বার্তা নিয়ে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে বাসবদত্তার সারা অঙ্গে এক আশ্চর্য পুলকিত শিহরন খেলে গেল। অপ্রস্তুত বাসবদত্তা তৎক্ষণাৎ তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বলল : ক্ষমা কর ওগো তরুণ তাপস। আমি ইচ্ছাকৃত করে কিছু করিনি। তবু হয়ে গেছে আমার অপরাধ। আমার চোখ দুটো পথের দিকে ছিল না, নিজেকে দেখতেই বিভোর ছিলাম। তাই বোধহয় তথাগত অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানে ফেরানোর জন্য আমাকে এতবড় শাস্তি দিল। ওগো সন্ন্যাসী না জেনে অপরাধ করেছি, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।

বাসবদত্তার আচমকা স্পর্শে পাথর হয়ে বসে রইল সন্ন্যাসী। আড়ষ্টভাবেটা কেটে গেলে স্মিতহাসির আভাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখমণ্ডল। মধুর গলায় বলল : কল্যাণী, কোনো দোষ করনি। তথাগত তোমার মঙ্গল করুন।

কী বেদনার্দ্র গম্ভীর সে কণ্ঠস্বর। বাসবদত্তা সোজা হয়ে বসল। সন্ন্যাসীর চোখের ওপর চোখ রাখল। সন্ন্যাসীর সামান্য স্পর্শেই মনে হয় চারপাশের পৃথিবীটা মুহূর্তে বদলে গেছে। একজন নগরবধূর জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে তা ভাবেনি কোনদিন। সন্ন্যাসী শ্রীপাদপদ্মে তার হাতখানি তখনও লেগে আছে। তার স্পর্শটা ভীষণ ভাল লাগছিল। মনে মনে বলছিল, এ তার পাপ হচ্ছে, কিন্তু পাপবোধের কোনও অপরাধবোধ কিংবা অনুশোচনা ছিল না তার। বরং ; সমস্ত মনটা দীন হয়ে সন্ন্যাসীর মাথা নুয়ে এল সন্ন্যাসীর পদতলে। রূপগর্বিতা বাসবদত্তার মনে হল ; সে কত তুচ্ছ, কত দীন, কী অসহায়! চোখের কোল জলে ভরে গেল। এরকম একটা অনুভূতি চেপে রাখা তার পক্ষে মুশকিল হল। আবেগ, ভাললাগা গোপন করতে সে অভ্যস্ত নয়। তাই কি ভেতরে এত অধীরতা? না, অন্য কোনও প্রত্যাশা আছে। সন্ন্যাসীর কাছে কী

প্রত্যাশা থাকতে পারে? সুদাস মালীর মতই তার অবস্থা। 'মুখে আর বাক্য নাহি সরে'। হাতে যদি সুদাসের মত পদ্ম থাকত তা হলে বাসবদত্তা তখনি তা সন্ন্যাসীর চরণপদ্মে নিবেদন করে ধন্য হত। দীন নম্র হৃদয়ে ভিখিরির মত বলল : আমাকে ক্ষমা কর। সামান্য দেবদাসী আমি। কিন্তু আজ — সে আর বলতে পারল না। উদ্‌গত কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

সন্ন্যাসী ক্ষমাসুন্দর চোখে বাসবদত্তার দিকে অপলক চেয়ে বলল : তথাগতের কাছে সকলেই মানুষ। সবাই অমৃতের পুত্র। কেউ পাপী নয়। শয়তানরা একজন সুন্দর মানুষকে অসুন্দর করে। তোমার ভেতর সুন্দরের মৃত্যু হয়নি। পাপ তোমাকে স্পর্শ করেনি। তুমি শুচিশুদ্ধা। তথাগতর করুণায় তুমি ধন্য হবে। প্রত্যেক মানুষকে নিজের মত হতে পারার, থাকতে পারার জন্য অনেক দাম দিতে হয়। প্রত্যেক মানুষের দুঃখ্ সে মানুষকে একা একাই বইতে হয়, তার জীবনপথে সে সত্যিই একা যাত্রী।

সন্ন্যাসীর কথাগুলো দূরাগত মন্ত্রধ্বনির মত বাসবদত্তার কানে ধ্বনিত হতে লাগল। পুলকে, গৌরবে, আনন্দে শরীর কণ্টকিত হতে লাগল। দুটো বড় বড় চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। কিন্তু বিস্ময় নয়। কেমন শূন্য।

পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সন্ন্যাসী। শরীর যেন প্রাণহীন, সংজ্ঞাহীন। বাসবদত্তার ভেতরটা কেমন যেন মমতায় ভরে যেতে লাগল। মমতা হল গড়ানে জমি। তবু মনটা এক জায়গায় এসে আটকে গেল। নানা সংস্কার ভিতরে ভিতরে কাজ করছিল। আর একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার বুকটা টনটন করছিল। কিছুক্ষণ বিবশ হয়ে চেয়ে রইল। আপন মনে একটু মাথা নাড়ল। তারপর সসঙ্কোচে মায়াবী গলায় বলল : প্রভু, আপনার এই নবীন কোমল তনু ধূলিধূসরিত কঙ্করময় এই মাটিতে কতই না ক্লেশ অনুভব করছে। দয়া করে আমার গৃহে চলুন। নিজের হাতে পরিচর্যা করে আমার সব আত্মগ্লানির প্রায়শ্চিত্ত করব।

হঠাৎ আতঙ্ক মেশানো একটা অদ্ভুত ভয়ে সন্ন্যাসী বিচলিত বোধ করল। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। নটীর মমতা-মাখানো সরল আচরণে কৌতুকাবিষ্ট হয়ে বলল : ভূমিশয্যাই সন্ন্যাসীর আদর্শ শয্যা। তোমার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। গৃহীর গৃহে সন্ন্যাসীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেবা করাই সন্ন্যাসীর ধর্ম, সেবা নেওয়া সন্ন্যাসীর পাপ। জেনেশুনে আমাকে তথাগতের কাছে অপরাধী কোর না।

বাসবদত্তা মাথা নোয়াল। উত্তর দিতে বেশ একটু জড়তা দেখা গেল। কুণ্ঠিত হয়ে বলল : আমি ব্যভিচারী, পাপী বলেই আমার সংসর্গে আপনার আস্থা কম। রমণী হওয়া

যদি অপরাধ হয়, তা হলে বিধাতা রমণী সৃষ্টি করলেন কেন? রমণীর সঙ্গ এবং সেবা যদি নিষিদ্ধ হয় তা হলে তথাগত সুজাতার পরমান্ন গ্রহণ করে কী করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন? রমণীর সেবা, যত্ন, পরিচর্যা না পেলে হয়ত এ জীবনে বোধিলাভ হত না তাঁর।

তার কথা শুনে সন্ন্যাসী হাসল। বলল, অন্ধকারে তুমি জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তির মতই জ্বলজ্বল করছ। তোমাকে ভয় করব কেন? কিন্তু এত রাতে পথের বাধাবিপত্তি, ভয় অগ্রাহ্য করে যেখানে যাচ্ছ, সেখানে যেতে বিলম্ব হয়ে যাবে। এমন সুন্দর অভিসারের দিন জীবনে খুব কম পাবে। এ অভিসার পরাণবঁধুর সঙ্গে তোমার। প্রভুর কী লীলা!

বাসবদত্তা সন্ন্যাসীর কথায় আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল মহাত্মন আপনার গন্তব্যস্থান?

আমি চলেছি প্রভুর সন্ধানে।

ফিক করে হাসল বাসবদত্তা। আপনিও তা হলে অভিসারে বেরিয়েছেন।

হুঁ, এক অর্থে আমারও অভিসার। পথটাই শুধু আমাদের আলাদা। তথাগতের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার দৃষ্টি উন্মোচিত হোক, তোমার কামনার পরিসমাপ্তি হোক। তোমার চিত্তে বৈরাগ্য আসুক।

কথাগুলো বলা শেষ করে সন্ন্যাসী পুনরায় ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন। বাসবদত্তার বুকে দয়ার সাগর উথলে উঠল। বলল : প্রভু আপনার ধূলিমলিন এই ভূমিশয্যা আমি সহ্য করতে পারছি না।

সন্ন্যাসী নির্লিপ্তভাবে বলল : তোমার উৎকণ্ঠার কোনও কারণ নেই। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে এভাবেই আমার নিশাবসান হত। এভাবে এ জীবনে অভ্যস্ত আমি। তোমার বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। আমার ঘুম পাচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে তোমার অভিসার-কুঞ্জে যাও। মুহূর্তেই সন্ন্যাসী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হল।

বাসবদত্তা তখনও তার খুব কাছে বসেছিল। অথচ সন্ন্যাসীর এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। কী নিরুদ্বেগ, কী নিরুত্তাপ মানুষ! রমণীর মধুর সঙ্গসুখ এবং সান্নিধ্যও তাকে বিচলিত করে না, আকর্ষণ করে না। তাই এত নিশ্চিন্তে সন্ন্যাসী ঘুমুতে পারছিল।

রূপগর্বিতা রমণীর অহঙ্কারে আঘাত লাগল। নিজের রূপ-লাবণ্য, প্রসাধনকে ধিক্কার দিল। যে প্রসাধন একজন পুরুষকে প্রলুব্ধ করে না, তার চিত্তকে চঞ্চল করে না, রমণীর সে সাজের মূল্য কী? রমণীর সাজসজ্জা, অলঙ্করণ সবই তো পুরুষের নজর কাড়ার জন্য। পুরুষের কাঙাল দৃষ্টির স্পর্শ যদি তার সর্বাঙ্গে লেগে না থাকল প্রবলভাবে এবং

সর্বক্ষণ তার সত্তা দিয়ে যদি তা অনুভব না করল, শিহরিত না হল, যদি তাকে গর্বিত না করল, এক অদ্ভুত অনুভূতিতে প্রশ্নে প্রশ্নে চমৎকৃত না করল, তা হলে সে সাজ তো অর্থহীন। সন্ন্যাসীর নিরুত্তাপ দৃষ্টিপাতে সেই কথাটাই বারংবার মনে হতে লাগল বাসবদত্তার।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারাগুলো ফিকে হয়ে এল। বাতাস ঠাণ্ডা হল। ঝিঁঝির ডাকও নীরব হয়ে গেল। জোনাক পোকার আলোও নিভে গেছিল। সন্ন্যাসী কিন্তু গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গিয়ে নিরুদ্বেগে নাসিকা গর্জন করছিল। বাসবদত্তার এ এক অবিশ্বাস্য নতুন অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন বয়সের পুরুষের সান্নিধ্যে এসেছে সে। কিন্তু এমন নিরুত্তাপ পুরুষের সংস্রবে আসেনি। নিজেকে উজাড় করে দিতে যে রমণী আকুল, তাকে কোনও পুরুষ বিমুখ করতে পারে, এমন দুর্লভ পুরুষরত্নের সাক্ষাৎ সে পায়নি। মুনি-ঋষিরাও রূপসী রমণীর রূপ-যৌবনের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সাধনা ও সিদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। এই তরুণ সন্ন্যাসী তাঁদের মত নয় বলেই তার প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করল বাসবদত্তা। মানুষের স্বভাবই হল যা দুর্লভ অনায়ত্ত, তাকেই সে জয় করতে চায়। বাসবদত্তারও খুব ইচ্ছে হল, সন্ন্যাসীর সংযমের লৌহকঠিন দৃঢ়তা, এবং রাত্রির মত নির্বিকার নির্লিপ্ততার বাঁধ ভেঙে তার আত্মাকে সে একবার দেখবে। অপমানহত মনের জ্বালা প্রশমিত করার জন্য বাসবদত্তার ভিতরটা নির্দয় হয়ে উঠল।

সহসা রাতের নীরবতা ভঙ্গ করে পায়ের ঘুঙুর জলতরঙ্গের মত বেজে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল সন্ন্যাসীর। তন্দ্রাজড়িমা গলায় বলল : যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনি, সময় যেদিন আসিবে, আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত ক্ষিপ্ত আক্রোশে বলল : থাম তুমি। বড় আত্মত্যাগ, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সংযম, প্রেম, মমতা, সেবা করার মনোবৃত্তি ছাড়া সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সন্ন্যাস মুখের কথায় হয় না। বিনীত বাক্যে তোমার অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, আত্মগর্ব গোপন নেই। নিজের ওপর তোমার আস্থা অতি সামান্য বলেই অন্যের বিশ্বস্ততার প্রতি তোমার সন্দেহ। যে মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শেখেনি, সে অন্যকে শ্রদ্ধা করবে কোথা থেকে? পাছে নগরবধূর গৃহে গেলে বুকে কামনার আগুন জ্বলে ওঠে, তাই তাকে ঘৃণায়, অবহেলায়, অশ্রদ্ধায় পরিহার করছ। আসলে নিজের চরিত্রের ওপর ভরসা ও বিশ্বাস কম বলেই স্বেচ্ছাচারী হওয়ার ভয় পাও। কিন্তু নারী কী শুধুই কামিনী? এই কামিনীর মধ্যে তো জননীও রয়েছে। সব নারীকে শ্রদ্ধা করতে শেখ

সন্ন্যাসী। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভক্তির পাত্রে বহুভোগ্যা, ইন্দ্রের বাঞ্ছিতা, রূপসী উর্বশী অর্জুনের শ্রদ্ধা-ভক্তির শতদলে জননী উর্বশীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ওপর গড়ে ওঠে যাবতীয় মানুষের সম্পর্ক। সেই অগ্নিপরীক্ষা করতে তথাগত তোমার আমার এই সাক্ষাৎ ঘটালেন। কিন্তু দুর্বলচিত্ত পুরুষের মত হেরে যাওয়ার ভয়ে জীবনের কঠিন কঠোর বাস্তব পরীক্ষা এড়িয়ে নিজেকে যথার্থ একজন সিদ্ধ সন্ন্যাসী বলে ভাবতে পার কি? ধিক তোমার কাপুরষতাকে, ধিক তোমার দুর্বলতাকে।

বাসবদত্তার আকস্মিক তীব্র ভর্ৎসনা এবং রূঢ় বাক্যে সন্ন্যাসীর আত্মসম্বরণ করতে কিছুটা সময় লাগল। তন্দ্রাজড়িত নিদ্রালু চোখ দুটো শেষ রাত্রির আকাশে অস্তমান চাঁদের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে গভীর চৈতন্যের ভেতর মগ্ন হয়ে বসে রইল। তন্দ্রাচ্ছন্নের মত ছাড়া ছাড়া গলায় বলল : ভেতর থেকে সাড়া না পেলে আমি কিছু করতে পারি না। আমার তথাগতের সব নির্দেশ যে সেখান থেকেই আসে। মানুষের জাগ্রত বিবেক, চৈতন্য তো তিনিই। তথাগতের কঠিন পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হয়ে গেছি। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সম্পর্কের একটা মাত্রা থাকে সুন্দরী। সেই মাত্রা অতিক্রম করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সুন্দর, মধুর সম্পর্কও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। আমি সীমারেখাটুকু অতিক্রম করিনি বলেই তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করবে, বিশ্বাস করবে।

বাসবদত্তার সব কথা হারিয়ে যায়। লজ্জায়, অপমানে দুই করতলে মুখ লুকিয়ে ভাবতে লাগল : হায়রে এ কী মানুষ! এ কী বিভ্রম হল তার! সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করতে গিয়ে এ কী পাপ করল! বাসবদত্তা বেশ একটু ভীত হয়ে পড়ল। বিপন্ন মানুষের মত অসহায় গলায় অস্ফুটস্বরে বলল : প্রভু, তবে কি কোনও অপরাধ হল আমার?

সন্ন্যাসী নির্লিপ্তভাবে বলল : তা তো জানি না। তবে আমার কাছে তুমি কোনও অপরাধ করনি।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কারও কাছে আমার একটা অপরাধ হয়ে গেছে। তিনি কে?

তথাগত জানেন।

তোমার ঘুম ভাঙিয়ে অসন্তোষ উৎপাদনের যে চেষ্টা আমি করেছি।, সেও তা হলে আমার ভিতর দিয়ে তোমার তথাগতই করেছেন।

জানি না।

তা হলে তুমি আমাকে 'না' বলে ফিরিয়ে দিও না। আমার গৃহে চল। বাকি রাতটা—

বাসবদত্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সন্ন্যাসী পুনরায় বলল : সময় যেদিন আসিবে, আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে। তুমি এখন যেথায় চলেছ, সেখানেও যাও। প্রেমাস্পদ তোমার প্রতীক্ষা করছে। সময় হলেই আমি তোমার কাছে যাব।

কিন্তু কবে সে সময় হবে?

ঠিক সময়ে ঠিক মুহূর্তেই তথাগত তোমার দুয়ারে যেতে নির্দেশ দেবেন। যতদিন সে নির্দেশ না আসছে, ততদিন তো তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে সুন্দরী। এবার খুশি হয়ে তোমার ঘরে যাও।

বাসবদত্তা গৃহে ফিরল ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে। মনে হল, এক রাত্রিতে তার ওপর দিয়ে বিশাল ঝড় বয়ে গেছে। তার কিছুই ভাল লাগল না। শুভ্র ফেননিভ কোমল শয্যার ওপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে সে দূরে বহুদূরে দিগন্তরেখায় আঁকা পাহাড়মালার দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে কেমন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ছাড়া ছাড়া গলায় বলল : জানিস মদনিকা, সন্ন্যাসী মিথ্যে বলেনি কিছু। আমার মন বলছে একদিন সে আসবে। আমার বন্ধ ঘরের দরজা সে খুলে দিয়েছে। চারদিক থেকে অফুরন্ত আলো-হাওয়ায় আমার ঘর ভরে গেছে। মুক্তির আনন্দে বুকখানা আমার খোলা আকাশের মতই বিরাট হয়ে গেছে। আমি নীল আকাশের অনন্ত মাধুরী পান করে আকাশগঙ্গায় ভাসছি।

মদনিকা হতভম্ব হয়ে বাসবদত্তার দিকে তাকিয়ে হাসল। মজা করার জন্য বলল : কাল রাতে খুব নেশা করেছিলে, তাই না? এখনও ঘোর কাটেনি।

বাসবদত্তা ওর কথায় চমকে তাকাল। বলল : হ্যাঁরে নেশায় পেয়েছে। মুহূর্তে একটা মহৎ, উদার, পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার সমস্ত চেতনা। আর তীব্র একটা আবেগে তার বুকের ভেতরে কান্নার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। মদনিকার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে শিশুর মত ডুকরে কেঁদে উঠল। কান্না-বিজড়িত গলায় বলল : মদনিকা এই ঘেন্নার জীবনটা আর বয়ে বেড়াতে পারছি না। অনেক পাপ করেছি। এবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বোন। বাঁচার লড়াইতে হেরে গেছি। সন্ন্যাসীও জানে না হেরে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় জেতা।

বাসবদত্তা সত্যিই অন্যরকম হয়ে গেল। রকমটা ঠিক কী ; মদনিকা ব্যাখ্যা করতে পারে না। নিশিদিন বুদ্ধের মূর্তির সামনে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। তার কোনও বাহ্যজ্ঞান থাকে না। ডাকলে সাড়া মেলে না। খেতে দিলে খায়, না দিলে খায় না। নিজের মনে কেবলই বিড়বিড় করে বলে, আমার মন বলছে সোনার বরন তরুণ সন্ন্যাসী আসছে। আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

মদনিকা অসহিষ্ণু হয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল : তোমার কী হয়েছে বল তো? মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি। সারাদিন বিড়বিড় করে কী বল?

বাসবদত্তা ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে : ছিঃ ও কী কথা! ওই সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা না হলে কোথায় পেতাম আমার সুখের অনুভূতি? তাঁর ছোঁয়ায় আমার নবজন্ম হল। সন্ন্যাসী তো বলল ভেতরের মানুষটাকে চোখে মেলে দেখ একবার। সারাজীবন কি ছদ্মবেশ পরে কাটিয়ে দেওয়া যায়? তারপর থেকে শুধুই মনে হয়, আমি অন্য এক নারীচরিত্রে অভিনয় করে যাচ্ছি!

মদনিকা রাগ করে বলল : বুঝি না বাপু, তুমি কী করতে চাও? সব ছেড়ে-ছুড়ে যোগিনী হয়ে বসে থাকলে পেট শুনবে? খদ্দের না এলে খাবে কী? এমনিতে অযত্নে, অবহেলায় কী করেছ শরীরটা, আয়নায় দাঁড়িয়ে দেখ একবার? তোমার দিকে তাকলে কান্না পায়।

বাসবদত্তার কণ্ঠ থেকে তৎক্ষণাৎ স্বতস্ফূর্তভাবে গান উৎসারিত হল। আয় সখী, আয় আমার কাছে/সুখী হৃদয়ের সুখের গান/শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ। /প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল/একদিন নয় হাসিবি তোরা/একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া/সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা।

মদনিকার রাগ হয়। রাগে গজর গজর করে বলল আদিখ্যেতা ভাল লাগে না। বেশ্যার আবার সাধ হয়েছে সন্ন্যাসিনী হতে।

কথাটা বাসবদত্তার বুক চিরে ফালা ফালা করে দিল। উদ্গত কষ্ট চট করে লুকিয়ে ফেলে বলল : বেশ্যা হয়ে কেউ জন্ম নেয় না। এই দুনিয়া তাকে বেশ্যা করে। বেশ্যাবৃত্তি পাপ কিন্তু বেশ্যা পাপী নয়। আমি শুধু পাপ থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করছি।

বেশ কয়েকটা ঋতু ঘুরে বসন্ত এল। নানা তীর্থ পর্যটন করে সন্ন্যাসী সেই প্রমোদ কাননের চত্বরে এসে বসেছেন। বকুল ফুলের গন্ধে ভরে আছে জায়গাটা। বনফুলের গন্ধের সঙ্গে রাতের গন্ধ, মাটির গন্ধ মিশে গেছে। রাত বটে। কিন্তু ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না কোথাও কোনও অন্ধকার নেই। কেবল গাছগাছালির নিচেই যা একটু আঁধার। পৃথিবীময় নরম চাঁদের আলো। কেবল চন্দ্রকান্তর প্রমোদগৃহই অন্ধকার। কেন? তবে কি বাসবদত্তা এসব ছেড়ে অন্য কোথাও গেছে? কিন্তু কেন? প্রশ্নটা করে নিজেই চমকাল। বড় অপরাধী লাগল নিজেকে। বাসবদত্তার সেদিনের প্রশ্নটা আজও মনে আছে তার। প্রবৃত্তি যদি মারের মারণাস্ত্র হয়, মারের রূপ হয়, তা হলে এই শয়তানের

স্রষ্টা কে? যিনি এই ভুবনের স্রষ্টা তিনিই সব শারীরিক সুস্থতার জন্য এই প্রবৃত্তিগুলোকে সৃষ্টি করে থাকেন, তা হলে প্রবৃত্তিকে এত ভয় পাওয়ার কী আছে? প্রবৃত্তিবেগ না থাকলে ঈশ্বরের ভুবন রসাতলে যেত। তা হলে এর প্রতি সন্ন্যাসীর এত অশ্রদ্ধা কেন? বাসবদত্তার এই প্রশ্নের জবাব আজও সন্ন্যাসী জানা নেই। অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তিবগ অসুস্থতার লক্ষণ। তাই বোধহয় বারবধূ বাসবদত্তাকে ভয় পেয়েছিল সেদিন। অশান্ত মনকে শান্ত করতেই তীর্থে তীর্থে ঘুরল। সবই মায়া মনে হল।

চিন্তার বোঝাটা মস্তিষ্ক থেকে নামাতে পেরে সে একটু স্বস্তি বোধ করল। নিদ্রা যাওয়ার জন্য পাষাণ-চত্বরে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। ঝিরঝিরে বাতাসে টুপটাপ করে কয়েকটা বকুল ঝরে পড়ল সন্ন্যাসীর গায়ে। খুব যত্ন করে কুড়িয়ে নিয়ে বুক ভরে ঘ্রাণ নিল। মুঠিবদ্ধ বকুলের দিকে চেয়ে নিজের মনেই বলল : 'এই বকুল যদি মায়া হয়, তবে কার প্রতিচ্ছায়া? শূন্যের? কিন্তু শূন্যের তো আকার নেই? প্রশ্নটা করে নিজেই তার জবাব দিল, আকাশও শূন্য, কোনও কিছুর প্রতিফলন নয়, তবু নীল বলে প্রতীয়মান হয়। এ মায়া হলেও বাহ্যত আকারহীন নয়। বকুল তো দৃশ্যমান বস্তু, তাই এর রূপ প্রতিফলিত হচ্ছে। তা হলে এর একটা সত্যবস্তু থাকবে কোথাও। তেমনি আমি ব্যক্তি মানুষটি যদি প্রতিবিম্ব মাত্র হই তা হলে কোথাও একটা সত্যকারের আমি আছে। সেই আমিটাকে বাসবদত্তা চিনিয়ে দিল আমার। নটী হলেও তার কাছে কিছু ঋণ রয়ে গেল।

এরকম একটা চিন্তায় সন্ন্যাসী যখন বিভোর, হঠাৎই দেখল আধো অন্ধকারে কয়েকজন লোক ধরাধরি করে কাকে রাস্তার ধারে শুইয়ে রেখে চলে গেল।

সন্ন্যাসীর চোখে তখন তন্দ্রা নেমেছিল। দু'চোখের পাতা একটু একটু করে বুজে আসছিল। আর সে তন্দ্রার মধ্যে শুনতে পাচ্ছিল, একটা নারী যেন অন্ধকারে কাতরাচ্ছে। তার কণ্ঠ থেকে ক্ষীণ আওয়াজ দূরাগত সঙ্গীতের সুরের মত কানের পর্দায় আঘাত করছিল। কিন্তু ঘুম-জড়ানো দু'চোখের পাতা কিছুতেই খুলতে পারছিল না।

হঠাৎই মরিয়া হয়ে নারী পাগলের মত চেঁচাতে লাগল -- শেয়ালে খেয়ে ফেলল গো, বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও ভাগ, যা যা -- হায় ভগবান শেষকালে শেয়ালে ছিঁড়ে খাবে? তথাগত আমায় বাঁচাও, নিষ্ঠুর হয়ো না। সমস্ত শক্তি কণ্ঠে পুঞ্জীভূত করে ভাঙা গলায় কাঁদতে কাঁদতে বলল : সন্ন্যাসী তুমি ফিরে আসবে বলেছিলে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায়। সেই সময় আর কবে হবে? শেয়ালগুলো আমাকে ঘিরে বসেছে। অসহায়ের মত মোটা গলায় কাঁদতে লাগল।

সন্ন্যাসীর ঘুম ছুটে গেল। তৎক্ষণাৎ ভূমি থেকে গাত্রোত্থান করে সে রমণীকে শেয়ালের মুখ থেকে রক্ষা করার জন্য হেই হেই করতে করতে দৌড়ে গেল। রমণী তখন সংজ্ঞাহীন। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় তাকে দেখে সন্ন্যাসী চিনল। আশ্চর্য হল মাত্র কটা ঋতুর ভেতর তার সেই রূপের একী হাল হয়েছে? মায়ায়, দয়ায়, করুণায়, মমতায় তার ভেতরটা গলে গলে পড়তে লাগল। শিয়রের ধারে বসে সন্ন্যাসী মাথাটা কোলে তুলে নিল পরম যত্নে। বিশ্রস্ত কালো চুলে ঢেকে যাওয়া মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলল : আমি এসেছি বাসবদত্তা।

অমনি মনে হল রমণী খলখল করে হেসে উঠল তার সেই অট্টহাস্য লক্ষ কলরোল হয়ে যেন আকাশে বাতাসে প্রবলভাবে বেজে উঠল। সংজ্ঞাহীন মুদ্রিত চোখে মুখে তার একটা প্রসন্ন পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল। মৃদু মৃদু হাসছে যেন বাসবদত্তা। খুব কষ্ট করেই বলল : সন্ন্যাসী, তোমার বিশ্বাসের কাছে হেরে গেলে তো! দয়া, মায়া, করুণা, তিতিক্ষা এই সব হৃদয়বৃত্তি মায়া হলেও মার নয় -- এগুলি পরিত্যাজ্য হয় না। হৃদয়বৃত্তি যদি পরিত্যাজ্য না হয়, তা হলে প্রেমের মত সুন্দর জিনিস, কামের মত স্বতস্ফূর্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবেগ দেহ মনকে যা সুস্থ ও সবল রাখে, জীবের বংশবৃদ্ধি ঘটায়, প্রাণধারাকে চিরপ্রবহমান রাখে তা কেন পরিত্যাজ্য হবে? বাসবদত্তার সেই কঠিন প্রশ্নের কোনও সদুত্তর সন্ন্যাসী সেদিন দিতে পারেনি। তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার আত্মগ্লানিতে সে শুধু দগ্ধ হয়েছে। মনে হল, আজ তার জবাব দেওয়ার দিন এসেছে।

সংজ্ঞাহীন বাসবদত্তার সারা শরীর প্রচণ্ড তাপে পুড়ে যাচ্ছিল। সারা গায়ে তার বসন্তের গুটিকা। সন্ন্যাসী নির্ভয়ে তার পাশে বসে পরম মমতায় সারা অঙ্গে শীতল জলের প্রলেপ মাখিয়ে দিল। মুখে জলের ছিটে দিল। অনুশোচনায় তার বুক তোলপাড় করছিল। সপ্রেমে নিরুচ্চারে বলল : বাসবদত্তা আমি হেরে গেছি। নবজীবনের অভিসারে তোমাকে আমি নতুন করে পেলাম। এ পাওয়া কোনওদিন ফুরোবে না আমার।

সত্যের আলো

শীত ঋতুর এক প্রসন্ন প্রদোষে সেসিম ক্লাবের পাঠকক্ষে একগুচ্ছ সংবাদপত্র নিয়ে রোজকার মত সংবাদ পড়ছিল মার্গারেট। দি ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট, দি লন্ডন ডেলি ক্রনিকাল, দি স্টান্ডার্ড পত্রিকাগুলো খুব ফলাও করে ভারতের এক হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ ছেপেছিল। মার্গারেট খুব মনোযোগ দিয়ে সেগুলো এক এক করে অনেক সময় ধরে পড়ল। সংবাদগুলি তার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। বারংবার মনে হচ্ছিল, এই অসামান্য মানুষটি এ জগতের হয়েও যেন সর্বাংশে এ জগতের কেউ নন। প্রত্যেকটি সংবাদপত্র তাঁকে এক স্বতন্ত্রপুরষরূপে বর্ণনা করেছে। যে অজ্ঞাত রহস্যময় দেশ থেকে যুগে যুগে মহা প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বুদ্ধ আসেন পৃথিবীতে,

যীশু আসেন -- সে দেশেরই যেন তিনি এক চিরন্তন অধিবাসী। তথাপি কী আশ্চর্য! এই দুঃখের হাসি-কান্না মায়ায় ঘেরা সংসারের সঙ্গে বত্রিশ নাড়ীর বন্ধন তাঁর।

মার্গারেটের দুই চোখে তন্ময়তা। শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র অতিক্রম করে ভারতবর্ষের মানচিত্রকে দেখছে। ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাস। সন্ধানী চোখ দুটো সারা ভারতবর্ষের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে পূর্বপ্রান্তে সমুদ্র উপকূলস্থ একটা ছোট্ট দেশের উপর স্থির হয়ে রইল। ঐ দেশ এবং তার মানুষজন সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। ভারতবর্ষ নামটিই শুধু জানে। সে দেশ তার স্বদেশভূমি আয়ারল্যান্ডের মতই পরাধীন এবং বৃটিশ শাসিত এক উপনিবেশ। তার স্বদেশ ও স্বজাতির মত ঐ দেশের মানুষদেরও অনন্ত দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। তাদের মতই ওরাও দুর্ভাগা, উৎপীড়িত, শোষিত এবং নির্যাতিত। মার্গারেটের কোমল প্রাণ সমবেদনায় আর্দ্র হলো। নিজের অজান্তে সহানুভূতি সূত্রে বাধা পড়ল মন। সেই মনটি সংবাদপত্রের বিবরণ অনুযায়ী কল্পনায় হিন্দু সন্ন্যাসীর এক ছবি আঁকল। গৈরিক আলাখাল্লা গায় সর্বত্যাগী এক সন্ন্যাসী -- মাথায় কটিতে কমলা রঙের উষ্ণীষ এবং কোমরবন্ধ। আঁখিদ্বয়ে অপূর্বজ্যোতি, চাহনিতে স্বর্গীয় শান্তিসুধা, কান্তিময় নিষ্পাপ মুখে যীশুর সারল্য।

দি ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেটের সাংবাদিকের সংবাদ সূত্রটি মার্গারেটের নজর কেড়ে নিল। কথাগুলো খুবই সত্যি। ধর্মের প্রভাব মানুষের মনে কত গভীর এবং ব্যাপক হিন্দু সন্ন্যাসীর মতো এমন করে আগে উপলব্ধি করেনি কেউ। গৈরিক উষ্ণীষধারী ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসী পাশ্চাত্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় প্রথম শোনালেন, পাশ্চাত্যের কলকব্জা, মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে মানুষের যে মঙ্গল এবং কল্যাণ হয়েছে তা অতি সামান্য। তার চাইতে যীশু-খৃস্ট এবং বুদ্ধের কয়েকটা কথায় মানব সমাজের ঢের বেশি উপকার হয়েছে। কথাগুলো মন্ত্রধ্বনির মত মার্গারেটের হৃদয়-মন আলোড়িত করল। তার ধর্মপ্রাণ মনটি ভীষণভাবে নাড়া খেল তাতে। বারংবার মনে হতে লাগল এই তরুণ সন্ন্যাসীর কণ্ঠে বিধাতা আহ্বানের শক্তি দিয়েছেন। এই শক্তির প্রতি মার্গারেটের অন্তরে শ্রদ্ধার উদ্রেক করল। নিজের অজান্তে মার্গারেটের বুকের ভিতরটা কাঁপল। কেন কাঁপল কে জানে? একটা কাগজ আর পেনসিল ছিল টেবিলে, সেটা নিয়ে নিজের মনে হিজিবিজি কাটতে লাগল।

ক্লাব থেকে বেরোনোর সময় লেডি নেল হ্যামন্ড দেখল, মার্গারেট নিবিষ্টচিত্তে চেয়ারে বসে কাগজে হিজিবিজি কাটছে। একটা অন্যমনস্কভাব তার মুখে চোখে প্রকট হয়ে উঠেছিল। নেল হ্যামন্ড ছিল মার্গারেটের বিশিষ্ট বান্ধবী। মার্গারেট কী করছে

দেখার কৌতূহল নিয়ে তার পিছনে দাঁড়াল। মার্গারেটের ছবি আঁকার একটা ঈশ্বরদত্ত হাত ছিল। তাই তার হিজিবিজি রেখাও ছবি হয়ে উঠল। অসংখ্য রেখার কাটাকুটির মধ্যে মনুষ্যাকৃতি একটা মুখ ফুটে বেরোলো। জট পাকানো রেখার মধ্যে দৃপ্ত দুটি চোখ, কপাল ছাড়া আর কিছু ভাল করে ঠাওর করতে পারল না নেল। এক অপার্থিব মাধুর্যে যেন পরিপূর্ণ সে চাহনি। যেন কোন স্বপ্ন সায়রের অথৈ সলিলে নিমগ্ন।

সবিস্ময়ে নেল নিজের মনে প্রশ্ন করল! ও কে? ও কার চোখ, কার কপাল? দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে ও কোন মন ভোলানো মানুষ এল পৃথিবীতে। ও যীশুও নয়, বুদ্ধও নয়, তা-হলে করুণাঘন দুই চোখ এঁকে মার্গারেট কী বোঝাতে চাইছে? নেলের খুব ইচ্ছে হয় তাকে প্রশ্ন করতে। কিন্তু পারল না। খুব সংকোচেই তার পিঠে হাত রাখল। তার হাতের ছোঁয়ায় মার্গারেটের ভিতরটা শিহরিত হল। আত্মমগ্ন ভাবটা মুহূর্তে অপসারিত হল। অপ্রস্তুত হাসি ফুটল অধরে। নেলও হাসল। বলল : গতকাল পিকাডিলির প্রিন্সেস হলে ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসী যে বক্তৃতা করেছিল ছোট বড় সব ডেলি কাগজে সে সংবাদ ছাপা হয়েছে। তুমিও দেখে থাকবে।

মার্গারেট নিস্পৃহভাবে বলল : এখানেই দেখলাম। আহা মরি কিছু নয়। খুবই মামুলি। মাতামাতি করার মত কিছু নয়। তবু খৃস্টের দেশের কাগজগুলো তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। হঠাৎ ওঁর মধ্যে কী দেখল তারাই জানে। আমি তো আলখাল্লা পরা সন্ন্যাসীর গেরুয়া বসন, কমলা রঙের উষ্ণীষ, আর কটিবন্ধের বর্ণনা ছাড়া কোনো মন কাড়া খবর দেখলাম না।

নেল স্মিত হেসে বলল : তুমি নিরপেক্ষ হতে পারলে না। কাগজগুলো যদি তাঁর বক্তব্য পুরোপুরি কভার করত তা হলে ভাবের রাজ্যে তোমারও বড় ধরনের এক বিপর্যয় ঘটে যেত। তাঁর সঙ্ঘে যোগ দেওয়ার জন্য তোমারও তর সইত না। সব ফেলে তাঁর ভাষণ শোনার জন্য দৌড়তে। ওঁর বক্তৃতা চার্চের পাদরীদের মত প্রাণহীন ভাবাবেগসর্বস্ব নয়। প্রাণ থেকে ভালবাসার বাণী ফোয়ারার মত ফিনকি দিয়ে উৎসারিত হয়। বুকের মধ্যে জমে থাকা গভীর অনাস্বাদিত বোধগুলোকে হঠাৎ করে গলিয়ে দিয়ে এক মুগ্ধ চমকে চমকে দেয় তাদের। মার্গারেট, এমন করে হৃদয় নিঙড়ে দেয়া ভালবাসা দিয়ে শ্রোতার হৃদয় জয় করে নেয়ার একজন বক্তাও ইংলন্ডে আমি দেখিনি। অমন করে আপনার বলে কাছে টানতে আর কোনো মানুষ পারবে না।

নিজের কানে তাঁর বক্তৃতা শুনেছ।

শুনেছি। তিনি শুধু দেখার মানুষ নয়, শোনারও মানুষ। জীবন আমার সার্থক হয়ে

গেছে। এর আগেও তাঁর বাণী শোনার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। গতকাল প্রিন্সেস হলে তাঁর বক্তৃতা আমার বুদ্ধির কেন্দ্রটা শিথিল করে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল এই ক্ষণটুকু যেন শেষ না হয়। তাঁর বুকে প্রেমের কল্লোল এখনো আমি শুনতে পাচ্ছি। সে বক্তৃতা শুনলে তোমার সব সংশয় দূর হতো। যীশুর প্রতি কী অগাধ প্রেম তাঁর বুকে, কী অমেয় শ্রদ্ধা। বুক ফুলিয়ে নিন্দে করলেন ধর্মবাদী ভণ্ড ধর্মযাজকদের ভণ্ডামিকে। তাঁদের গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারকে। তুমি যেভাবে চিন্তা কর অনেকটা সেভাবেই খৃস্টের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে অকম্পিত বুকে তীব্র ভাষায় নিন্দে করলেন ধর্মব্যবসায়ী এবং মিশনারীদের অসাধুতা, স্বার্থপরতা এবং হৃদয়হীনতাকে। তারপর বললেন, যীশু বলেছেন মানুষ যেমন নিজেকে ভালবাসে তেমনি ভালবাসবে তার প্রতিবেশী। কিন্তু হায়, যীশুর ভক্তরা শুনল না তাঁর কথা। তাঁর কথায় কান না দিয়ে অবাধে প্রতিবেশীকে শোষণ করছে, বঞ্চিত করছে, দারিদ্র্যে, দুর্ভিক্ষে তাদের শৃঙ্খলিত করে রাখছে। এই সব খৃস্টানদের নিন্দে করলে খৃস্টধর্ম অশুদ্ধ হয় না। বি পিওর, হ্যাভ ফেথ বি ওবিডিয়েন্ট।

মার্গারেট চুপ করে রইল। তার যুক্তিবাদী সংশয়ী মনটা আসলে মনের মধ্যে একটা জবাব খুঁজছিল। নেলের আবেগ এবং উচ্ছ্বাস নিছকই একধরনের ভাললাগা, যা তার চার্চ-নিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের প্রতি একপ্রকার বীতস্পৃহা থেকে জাত। এখানে তার হৃদয়াবেগ যতখানি সক্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি ততখানি নয়। তাই হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রত্যেকটি কথায় অবাক হয়েছিল। মার্গারেট তার কথায় প্রতিবাদ করল না। বেশ একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল : জান নেল, মানুষের স্বভাবই হলো নতুন কথা শুনলে গলে পড়ে। তাকেই ধ্রুব সত্য মনে করে। কিন্তু মন্দ কথা শুনলে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করে। হিন্দু সন্ন্যাসীর কথা বিশ্বাস করা তোমার কোনো অন্যায় হয়নি। কথাগুলো বলা শেষ করে শুকনো ঠোঁটে বিজ্ঞের হাসি হাসল মার্গারেট।

নেল হতভম্বের মত মার্গারেটের দিকে চেয়ে থেকে বলল : তুমি অবিশ্বাস কর।

বিশ্বাস করার মত যে কথাগুলো আছে তা অত্যন্ত মামুলী। এমনিতেই লন্ডনের মানুষের মনে ইদানীং খ্রীস্টধর্মের প্রতি দিন দিন একধরনের বিরূপতা এবং বীতস্পৃহা প্রবল হচ্ছে। তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে এই যাজকীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে আর কোনো উদার মানবীয় ধর্ম কি পৃথিবীতে নেই? লোকচরিত্র অভিজ্ঞ হিন্দু সন্ন্যাসী গণমনের সেই প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে খুব সহজে লন্ডনবাসীর মন জয় করে নিল। অথচ, তোমরা কেউ তাঁর চালাকিটা ধরতে পারলে না। এও একধরনের প্রতারণা।

নেল ওর কথায় রাগল না। স্মিত হেসে বলল : বিশ্বাস করা না করা প্রত্যেকের নিজের ব্যাপার। তিনি কারো ওপর তাঁর ধারণা চাপিয়ে দিচ্ছেন না। এ তাঁর নিজের কথা-চিরন্তন সত্যের উপলব্ধি। এর ভেতর কোনো চালাকি নেই। প্রতারণা করারও কোনো চেষ্টা নেই।

মার্গারেট নিজের যুক্তিতে অবিচল থেকে বলল : আমাদের দোদুল্যমান মনকে দুলিয়ে দিয়ে বিপর্যস্ত করা, অন্য এক ধর্মমতের কথা তাকে আর্ত করে তোলা তাঁর উচিত কাজ নয়। আমার প্রতিক্রিয়া খোলা মনে বলার সঙ্গে অবিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি শুধু বলতে চাই আমার বিশ্বাস, যুক্তি, চোখ, কান, মগজ কারো কাছে বাঁধা দিইনি।

নেল বিস্মিত ও মর্মাহত হল। যেন এমন কথা জন্মে শোনেনি। একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে সবিস্ময়ে বলল : এ .কমন কথা তোমার মার্গারেট। হিন্দু সন্ন্যাসী বলেছেন, তর্ক করে ধর্ম, ঈশ্বর কোনোট: .মলে না। এ হলো বিশ্বাসের ব্যাপার। যে যত যুক্তিবাদী তার সংশয় তত প্রবল। তুমি তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। তুমি সত্যিই একটু আলাদা। একটু অন্যরকম।

মার্গারেটের অধরে একটু করে হাসি দেখা দিল। বলল : কী জানি? আমার মধ্যে কী অসাধারণত্ব আছে, তোমরাই জান।

নেল বেশ একটু গম্ভীর গলায় অভিযোগ করে বলল : মার্গারেট নিজেকে ফাঁকি দিও না। নিজেকে প্রতারণা করাও পাপ। তোমার সামনে সাদা কাগজটা কি শুধুই কতকগুলো হিজিবিজি রেখা? না, তুমি তো মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশেষ করে শিশু মনস্তত্ত্ব ভালো করেই জান। মানুষের সব কাজেই মনের একটা বড় ভূমিকা থাকে। অবচেতন মনের কিছুই নিজের অজান্তে, অসতর্কভাবে কখন যে বাইরে বেরিয়ে পড়ে মানুষ নিজেও জানতে পারে না। ঐ রেখাগুলো তেমনি তোমার মনকে মেলে ধরেছে। বহুবিধ চিন্তা ভাবনা সংশয়-জিজ্ঞাসার যে জট তোমার মনে সৃষ্টি হয়েছে তা প্রতিটি রেখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মুদ্রিত হয়েছে। আসলে তুমি একটা জালের মধ্যে রয়েছ। এই সংবাদপত্রগুলো পড়ে তোমার মনে হয়েছে ঐ হিন্দু সন্ন্যাসী তোমাকে পথের সন্ধান দিতে পারে। কারণ, তোমার বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছ ও কণ্ঠস্বরে। বিভিন্ন বক্তৃতায়, আলোচনাসভায়, মানুষের বুদ্ধির কাছে, বিবেকের কাছে, আত্মার কাছে তোমার প্রশ্ন -- সত্য কি, ধর্ম কি? ধর্ম ও সত্য কী এক? সেই ধর্ম কোথায়, যে ধর্মে সকলের স্থান, যা উদার এবং মহৎ যা সকলকে অকপটে বুকে টেনে নিতে পারে? যে

ধর্মে মুক্তি কেবল কয়েকজন মানুষের জন্য নয় জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের লভ্য, সেই মুক্ত দৃপ্ত মহাপ্রেমের প্রার্থনা কর তুমি। ভারতের এই হিন্দু সন্ন্যাসী সেই মহাপ্রেমের বাণী বহন করে তোমার হৃদয়ের বন্ধ কপাটে করাঘাত করেছেন। আর তুমি অভিমান করে কপাট বন্ধ করে বসে আছ? এখন কি তোমার অভিমান করা সাজে? ওঠ, জাগ এগিয়ে চল তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে।

মার্গারেট একটুও অভিভূত হল না। কৌতুক করে বলল : চমৎকার! তোমার কথাগুলো মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। কল্পনা হিসেবে খুবই উৎকৃষ্ট। আবেগের কাছে এর একটা বিরাট মূল্য আছে কিন্তু কোন বাস্তবতা নেই।

নেল বেশ একটু হতাশ হয়ে বলল : তুমি তার্কিক একজন। তর্কেই তোমার আনন্দ। হৃদয়ের অনেক কিছুই বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা হয় না। আগামী নভেম্বর মাসে ঐ সন্ন্যাসীকে লেডি ইসাবেল মার্জেসন তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ করেছেন। উনি রাজি হয়েছেন। দিন স্থির হলে তোমাকে জানাব। তুমি এস। আসল নকল, সংশয় অবিশ্বাস যাচাই করে নেওয়ার এমন সুযোগ হাতছাড়া কর না। রাত হয়েছে। বাইরে তুহিন পড়ছে। গুড্ নাইট।

মার্গারেট মুখ টিপে হেসে প্রত্যুত্তরে বলল : নাইট। আমিও বেরোব।

নেলের পেছনে পেছনে মার্গারেটও বেরিয়ে পড়ল। একটা ভাড়া ফিটন গাড়ি নিয়ে বাড়ির দিকে চলল। নেলের কথাগুলো তার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল। সারাটা পথ সন্ন্যাসী সম্পর্কে অনেক কিছু কল্পনা করল।

অশ্বখুরের আওয়াজ তুলে ফিটন গাড়িগুলো দুলকিচালে পথ দিয়ে হনহনিয়ে চলেছিল। তাদের পিছনে রেখে মোটরগাড়িগুলো হুস করে ধুলো উড়িয়ে একের পর এক যাচ্ছিল। আর ফিটন গাড়ির ঘোড়াগুলো হাঁসফাঁস করতে করতে মোটর গাড়ির পিছন পিছন দৌড়তে লাগল। প্রতিযোগিতায় একালের গাড়ির সঙ্গে সেকেলের গাড়ি পেরে উঠছিল না। ক্রমাগতই পিছিয়ে পড়ল। পথের দিকে চাইলেই জীবনের গতিকে ভীষণভাবে অনুভব করা যায়। চলমানের সঙ্গে মনটাও চলতে থাকে। ও জগতে কেউ কোথাও থেমে নেই। সবাই চলেছে যে যার নিজের গন্তব্য পথে। একেই বলে জীবন। জীবন মানে জীবন্ত থাকা। প্রতিমুহূর্ত নদীও তার গতি বদলে চলেছে। চলার মধ্যে একধরনের আনন্দ আছে। যারা থেমে থাকে, স্থবিরতার শিকার হয়েছে — তারা হয়তো জানে না সে কথা। কিন্তু মানুষের সভ্যতা এক চলমান পৃথিবী। তা-হলে তার ধর্ম, সংস্কার, আচার, প্রথা, বিশ্বাস গোটা সমাজব্যবস্থা অচলায়তনের নিগড়ে বাধা কেন? মানুষের জগৎও প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে। আজ যেটাকে নিশ্চিত সত্য বলে জানে

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে কালই সেটাকে পরম ভ্রান্তি বলে মেনে নিতে হয়। হয়তো এমন না হলে মানুষের জানার ইতিহাস এক নিশ্চল বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকত। তা-হলে হাজার হাজার বছর আগের ধর্মীয় বিধি-বিধান মানুষের কাছে কোন্ চিরন্তন সত্যকে পৌঁছে দিল যা অপরিবর্তিত থাকবে যুগযুগান্ত ধরে? মানুষ তো নিরন্তর সত্যকে সন্ধান করে ফিরছে, কোনো সত্যই অপরিবর্তিত নয়। তাই একটা অতৃপ্তি নিরন্তর পূর্ণতার দিকে চলেছে। পরিপূর্ণতাই মুক্তি। তিনিই পরিপূর্ণ, যিনি কোনো কিছুর দ্বারা বদ্ধ নয়। বদ্ধ ধারণাই মানুষকে মুক্তির তৃষ্ণায় আকুল করে।

বাড়ি ফিরে প্রতিদিনের মত গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করল। তারপর সকাল পর্যন্ত একটানা লম্বা ঘুমোল। শান্তির ঘুম। মন গভীরতায় প্রশান্ত হলেই তবে এমন আরামের ঘুম হয়।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মার্গারেট স্বপ্নে দেখছিল পিতা স্যামুয়েল যেন ভারতের সন্ন্যাসীর মত বুকের ওপর দুবাহু বেষ্টন করে শুভ্র আলখাল্লা পরে তার সামনে দীর্ঘ বক্তৃতা করছে। আর সে একাগ্রচিত্তে তা শুনছে। প্রিয়তম কন্যাটির যীশুর প্রতি ভক্তি দেখে স্যামুয়েল মৃদু মৃদু হাসছে যেন। ঐ হাসিতে তার মন ভেসে গেল সুদূরে। যাকে দেখলে, চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রাণে আনন্দ হয়, আত্মার তৃপ্তি হয়, বাতাস মধুর হয় সেই পিতা স্যামুয়েলকে সে দেখছিল। আঠারো বছর আগের ঘটনা। অথচ কী আশ্চর্য দশবছরের মার্গারেট সেই ঘরে পিতার খাটের পাশে বসে আছে। আঠাশ বছরের মার্গারেট তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এবং তার সঙ্গে কথা বলছে। আর সে তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

ক্ষয়রোগাক্রান্ত স্যামুয়েলের শীর্ণ, শান্ত, কঙ্কালসার দেহটা বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে ছিল। খক্‌খক্ করে কাশছিল ঘন ঘন। ব্যথার জায়গায় হাত দিয়ে চেপে ধরছিল বুকের পাঁজর। তারই মধ্যে আদরের কন্যাটির সঙ্গে কথা বলার কী প্রাণান্তকর চেষ্টা তার। কথা বলার সময় তার চোখ মুখ রাঙা হয়ে গেল। শ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। হাঁফাচ্ছিল ভীষণ। মুখের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মার্গারেট তার কষ্ট লাঘব করার জন্য বুকটা ডলে দিতে লাগল। স্যামুয়েল জোর করে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলল : আমার কাছে আসতে নেই মা। এ কালব্যাধি একবার ধরে যাকে, শেষ করে ছাড়ে তাকে।

মার্গারেটের বুকটা কেমন করে উঠল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল : বাবা, ওসব কথা বল না। আমার ভীষণ ভয় করে। তুমি যীশুর সেবক। তিনি তোমাকে করুণা করবেন। তাঁর হাতের অমৃত ছোঁয়ায় কত কুষ্ঠ-রোগী, ক্ষয়-রোগী সেরে গেছে। তোমার বেলায় তাঁর করুণার এত অভাব কেন? তাঁকে কত ডাকি আমি। কত বলি, প্রভু বাবাকে পরিত্যাগ

কর না। তাঁকে করুণা কর, দয়া কর। তোমার কাছে আমি আর কিছু চাই না, আমাদের সব পাপ, অন্যায় গ্লানি মন্থন করে তুমি আমাদের অন্তরে ফিরে এস। বাবাকে নতুন জীবন দাও।

মার্গারেটের ছেলেমানুষীতে হাসল স্যামুয়েল। খুব বিষণ্ণ মলিন হাসি। বলল : পাগলি মেয়ে। তাঁর কোনো অভাব নেই, দৈন্য নেই। তাই তো অকাতরে নিজেকে নিবেদন করতে পেরেছিলেন মানবসেবায়। কিন্তু আমরা তাঁর সেবার মহিমায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করেছি। তাঁর করুণা তাই আমাদের কাছে পৌঁছয় না। তাঁর অমিয় মহিমা, প্রেম, মহানুভবতা প্রচার করার নাম করে মানুষকে ঠকাচ্ছি, বঞ্চিত করছি, শোষণ করছি। দারিদ্র্য, অসহায়তার সুযোগ নিয়ে, করুণার হাত বাড়িয়ে আমরা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মবিশ্বাস কেড়ে নিয়ে যীশুর নামে ক্রীতদাস সৃষ্টি করছি। যীশুর সেই নিঃস্বার্থ সেবা, প্রতিদানহীন করুণা, প্রেম খ্রীস্টান মিশনারীদের কোথায়? যে প্রেম ছিল করুণার, উদার, মুক্ত এবং অকৃপণ তাকে আমরা সবাই ক্রুশবিদ্ধ করেছি। প্রতিনিয়ত এভাবে আমরা প্রেমের ঠাকুরকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছি।

মার্গারেট পিতাকে বাধা দিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বলল : তুমি কাশছ, উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছ। এখন চুপ কর। পরে বলো আবার। কিন্তু স্যামুয়েল থামল না। বলল : কোরাণে হজরত মহম্মদ বারবার বলেছেন, যে যীশু কখনও ক্রুশবিদ্ধ হননি। যীশুকে কেউ ক্রুশবিদ্ধ করতে পারে না। এটা শুধুই রূপক। আমার তাই মনে হয়। গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের স্বপ্ন একটা গণ্ডির মধ্যে তাঁর বিশালত্বকে বন্দী করে রেখেছি। তাঁর অকৃপণ করুণাকে কৃপণ করুণায় পরিণত করে প্রেমের মানুষকে ছোট করেছি। কথাগুলো বলার সময় স্যামুয়েলের মুখখানা এক আশ্চর্য সুখে ও আনন্দে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। কিন্তু দমকা কাশিতে দম আটকে যাওয়ার মত হলো।

মার্গারেট বেশ একটু অস্থিরতা এবং উদ্বেগ নিয়ে বলল : দোহাই বাবা, চুপ কর। কথা বলে আর কষ্ট দিও না নিজেকে। কপট রাগ দেখিয়ে বলল : এবার কথা বললে চলে যাব।

খুব কষ্ট করে স্যামুয়েল হাসল। থেমে থেমে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল : তুই কাছে থাকলে বড় শান্তি পাই মা। মনটা ভরে ওঠে আনন্দে। তোকে আমার অনেক কথা বলার আছে মা। সময় ফুরিয়ে আসছে। কথাগুলো বলার সময় যদি না হয় আর।

মার্গারেটের বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। চমকানো আতঙ্কে আর্ত-কণ্ঠে বলল : বাবা। অমন কথা বলতে নেই। আমাকে ভয় দেখিয়ে তুমি খুব মজা পাও বুঝি।

আমি থাকলেই তুমি বক বক করবে।

পাগলি! তারপর বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে চুপ করে শুয়ে রইল। একটু দম নিয়ে বলল : মার্গারেট এখন যেটুকু সময় আছে বুক ভরে ভগবানের পৃথিবীর মুক্ত বাতাস নেব। তারপর ঘুমিয়ে পড়ব। কোনও মস্ত গভীর মহীরুহের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘুমোব, লম্বা ঘুম। কোনও কাজ নেই, কারো ওপর দাবি নেই, কোনো প্রত্যাশা নেই। শুধু ঝিরঝিরে হাওয়া, পাখির ডাক, ঝরাপাতার দীর্ঘশ্বাস আর শুভ্র ফলকের উপর একটা ব্যর্থ জীবনের নাম লেখা থাকবে স্যামুয়েল নোবেল। শুকনো পাতারা আছড়ে পড়ে অস্ফুট স্বরে কাঁদবে।

মার্গারেট স্যামুয়েলের মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে ব্যাকুল গলায় কান্না কান্না স্বরে বলল : বাবা, আর বল না।

ঠোঁট থেকে তার হাতখানা আস্তে আস্তে সবিয়ে দিল স্যামুয়েল। জলভরা চোখে বলল : আঃ কী আরাম। ঈশ্বরের ভালবাসায় অভিষিক্ত হল আমার হৃদয় মন। যে ভালবাসা মানুষের সমবেদনায় গভীর, ব্যাকুলতায় সুন্দর, নিবেদনে ধন্য, প্রতিদানের অপেক্ষা করে না, তাকেই বলে ঈশ্বর-প্রীতি। এই অনাবিল আনন্দ, শুদ্ধ আত্মার সঙ্গলাভে এ জীবন যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে তখনই ঈশ্বর লাভ হয় অন্তরে। মানুষী ভালোবাসায় আমরা এবং ঈশ্বর এক হয়ে যাই।

মার্গারেট বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল : বাবা, তুমি কাশছ। একটু কম কথা বল।

স্যামুয়েল তার হাতখানা মুঠোর মধ্যে ধরে বলল : একটা গল্প বলি শোন। তুই তখন ছোট্ট। বছর চার বয়স হবে। আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রভর শহরে থাকিস। একটা সুন্দর লন ছিল আমাদের। সাজানো গোছানো একটা উদ্যান। তোর ভীষণ প্রিয় ছিল ঐ বাগিচাটা। ওল্ডহ্যাম থেকে মাঝে মধ্যে যেতাম আসতাম। বিকেলটা তোকে সঙ্গ দিতেই হত। হরেকরকম খেলা করতে হত রোজ। খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে খেলায় যখন ঢিলে দিতাম তখন খেলার জন্য তুই পাগল হয়ে যেতিস। বাধ্য হয়ে তোর সঙ্গে দৌড়তে হতো। না হলে বল নিয়ে লোফালুফি খেলতে হতো। তারপর, একসময় তো খেলায় মন বসত না। মার কাছে যাওয়ার বায়না করতিস। আমি তখন সুন্দর একটা পুতুল দিয়ে আরো কিছুক্ষণ তোকে ধরে রাখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তোর মন মার কাছে যাওয়ার জন্য তখন পাগল। মাকেই তখন দরকার। খেলাতে আর মন নেই। প্রিয় পুতুলের ওপরও আকর্ষণ নেই। কান্না ধরেছিস -- না, মার কাছে যাব আমি। যতক্ষণ

না ছাড়তাম ততক্ষণ কেঁদে ভাসাতিস। মার কাছে গিয়ে একেবারে অন্য মেয়ে। গোটা ব্যাপারটা ভীষণ উপভোগ করতাম। আজ কথাগুলো খুব মনে পড়ছে। এই পৃথিবীতে আমরা সবাই ঐ শিশুর মতো। অর্থসম্পদ নিয়ে ভুলে থাকি। একসময় মন ভরে না তাতে। তখন জননীরূপিনী ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য মনটা ব্যস্ত হয়। এইটা নিয়ম। সব তৃষ্ণা একদিন ঐ অনন্তের পায়ে গিয়ে মেশে। যীশু আমাদের অন্তরের মধ্যে আছেন। গভীর ভালবাসার মধ্যে আমরা তাঁকে উপলব্ধি করি। যখন খ্রীস্টকে অন্তরে পাবে তখন পরম আনন্দে মন ভরে যাবে। তোমার মায়ের কাছে যাওয়ার মতই সে তৃপ্তি।

মার্গারেটের দু'চোখ ভরে জল নামল। আর তাতেই ঘুমটা ভেঙে গেল তার।

বাড়ি থেকে মার্গারেটের নিজের প্রতিষ্ঠিত রাস্কিন স্কুল খুব দূরে নয়। ঐটুকু পথ ভগিনী মে'র সঙ্গে রোজ হেঁটে যায়। দু'বোন একই স্কুলে শিক্ষয়িত্রী। গল্প করতে করতে কখন যে তারা স্কুলে পৌঁছে যেত খেয়ালই হত না। রোজই নানা কথা হয় তাদের। বেশি কথা মার্গরেটই বলে। কিন্তু আজ সে চুপ করেছিল সর্বক্ষণ। মে'র অস্বস্তি লাগছিল। কেমন একটা বিষণ্ণ গম্ভীবভাব থমথম করিছল তার মুখে। মুখ দেখে যে তাকে বোঝার চেষ্টা করছিল। নিজের মনে স্বগতোক্তি করল মাই গুডনেস। এক বাড়িতে এক ঘরে, এক খাটে থেকে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে কতই কম জানে। মানুষের মনের গতিপ্রকৃতি বিধাতা কেন, সে নিজেও বোধ হয় কম জানে। বেচারী।

মার্গারেট মে'র দিকে ফিরে তাকানোর সময় একটা মন খারাপ করা আর্তি তার সমস্ত মুখ ফ্যাকাসে করে দিল। বুকের গভীর থেক একটা লম্বা শ্বাস পড়ল। মলিন হেসে বলল : প্রত্যেকের একটা নিজস্ব চাওয়ার জগৎ থাকে। সেখানে সে একা, ভীষণ একা। সেই একাকীত্বের সংবাদ তার মনও জানে না। মাঝে মাঝে অদ্ভুত ঠাণ্ডা দ্বেষহীন, ঈর্ষাহীন এই মনটা ভিতরে ভিতরে ভীষণ এক যন্ত্রণা দেয়। প্রতিকারহীন যন্ত্রণা দুর্বল করে আমাকে। যেহেতু কোনো বাধা পাই না তাই প্রতিহত করার প্রশ্ন ওঠে না। কী বা করব ভেবেও পাই না।

মে'র দু'চোখে কৌতুক, অধরে মিষ্টি হাসি। বলল : সিস্টার মনে হচ্ছে, কেউ তোমার মন চুরি করেছে আবার। ক'টা হল এনিয়ে? তিন বোধ হয়। একটু ভেবেচিন্তে.

হিসেব করে পা ফেল।

মার্গারেট তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল : সব তাতেই ফাজলামি। তোর সঙ্গে ইয়ারকি করার মত মন নেই আজ।

তোর প্রবলেমটা আমাকে বল। চটপট সমাধান করে দিচ্ছি।

তুই যা ভাবছিস তা নয়। মন হরণের মত আপাতত কোনো ঘটনা ঘটেনি। প্রেম, বিয়ে আমার কপালে নেই। আর পাঁচটা মেয়ের মত সংসার করার স্বপ্ন আর দেখি না। ভালোও লাগে না। ঈশ্বর বোধ হয় চান না বলেই আমার নীড় বাঁধার সাধ ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে শুধু বঞ্চিত করেননি, প্রতারিতও করেছেন।

মার্গারেটের কষ্টটাকে লঘু করতে মেরি বলল : জীবনে ওরকম অজস্র ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। তাই বলে, স্মৃতি আঁকড়ে থেকে বাকি জীবনটা নষ্ট করা কিংবা ব্যর্থ করার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। তাতে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা মহত্ত্বও প্রকাশ পায় না। তুই অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ বলেই বেশি কষ্ট ভোগ করিস। তুই ভীষণ ভালো বলে, ঈশ্বর তোকে শুধু দুঃখের বোঝা বইতে দিয়েছে। আমাদের এই অভাবের সংসারটাকে কীভাবে যে একলা ঠেলে নিয়ে গেছিস সে তো আমরা জানি।

দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে উঠল মার্গারেট। বলল : সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। কথাটা বোঝা বয়ে বেড়ানো নয়, উত্তরণ। বুঝলে উত্তরণ হল জীবনের আসল কথা।

উত্তরণ মানে অতিক্রম করা নয়, নিরন্তর চলা। এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়া।

আমি থেমে আছি কি? কত ঝড়-ঝঞ্ঝা গেছে জীবনের উপর দিয়ে। তবু দুঃখ, ব্যথা, বেদনায় ভেঙে পড়িনি, কিংবা থেমেও যাইনি। জীবনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের দিকে উল্কার মত ছুটে গেছি। একঘেয়েমিতে যখন ক্লান্ত লাগে তখন অতীতকে রোমন্থন করে একটু শান্তি পাই। নিজের কাছে নিজেই দামি হয়ে উঠি। দামি হওয়ার জন্য কত মূল্য দিতে হয় এক জীবনে। কত দুর্গম সব অজানা পথ অতিক্রম করে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি ; ভাবতে বেশ লাগে কিন্তু।

মেরি বলল : এসব কথা হঠাৎ এমন করে মনে এল কেন? সত্যি কথা বল-তো দিদি, কী হয়েছে তোর? নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করছিস তুই। সে খেলাটা প্রেমের যদি নাও হয়, তা-হলে কোন হতাশা, ব্যর্থতা থেকে মন এমন আকুল হল?

গাঢ় গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো একেবারে অন্তঃকরণ থেকে বেরিয়ে এল। বলল : মে কাল রাতের অস্থিরতায় যা বুঝিনি, আজ সকালের প্রকৃতিস্থতায় স্থির হয়ে বুঝিছি যে, আমার জীবনে একাধিক মস্ত বড় ঘটনা জ্ঞান হওয়া থেকে ক্রমাগত ঘটে গেছে। এখনও ঘটছে। অবশ্য এটা ঘটনা, না অন্য কিছু সেটা আগামীকাল বিচার করবে। আমি বলি, যাই ঘটে থাকুক প্রতিটি ঘটনা আমার জীবনে এক একটা মাইলস্টোন। একটার পর একটা মাইলস্টোন অতিক্রম করে যত এগিয়ে চলেছি, ততই নিজেকে নিয়ে আমার কৌতূহলের অন্ত নেই। একজন পাদ্রীর মেয়ে এবং নার্সারি স্কুলের এক শিক্ষিকা সম্পর্কে সমাজের মানুষের যে অবজ্ঞা, অনাদর আছে সেটা আমার জীবনে কোনো বাধা হয়নি। ব্যর্থতায়, হতাশায় ভেঙে পড়িনি। কারো সাহায্য ছাড়াই নিজের প্রচেষ্টায় উতরে গেছি। অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে সাগরে যাওয়া নদীর চলকানো জলের মতই উদ্দাম আবেগে ছুটে চলেছি। সেই সময় অতীতের দিকে ফিরে তাকানো খুব প্রয়োজন হয়। জীবনে এই যতিটা নতুন প্রাণ দেয়। একঘেয়েমি আর ক্লান্তি বদলে, নতুন করে চলা। গতি বদলের আর এক নামই অনন্ত চলা, সময়ের স্রোতে অফুরান বেঁচে থাকা। আজ তাই খুব বেশি করে মনে হচ্ছে একঘেয়ে অভ্যাসের বন্দী জীবন যে নিজেকে নবীকৃত করতে না পারে প্রতিমুহূর্ত, সে থেমে যায়। নদীর মত গতি বদল করে যে চলতে না জানে সে থেমেই থাকে। বদলানোর নির্দেশটা যতক্ষণ মন থেকে না আসে — মনটা তৈরি না হয় ততক্ষণ কোনো পরিবর্তনই প্রকৃত পরিবর্তন হয়ে ওঠে না। আজ গভীর করে তাকে অনুভব করার এক অফুরন্ত আনন্দে মনটা ভরে আছে।

মেরি মন দিয়ে মার্গারেটের কথা শুনছিল। দ্রুতপায়ে মার্গারেটের সঙ্গে যেতে যেতে বলল : আমাদের তিন ভাইবোনের মধ্যে তুই একেবারে আলাদা। ঈশ্বর তোকে একটু অন্যরকম করে তৈরি করেছে। আবার তুইও তাঁর করুণায় নিজের একটা আলাদা ভুবন করে নিয়েছিস। সে ভুবনটা যে কী তুইও বোধ হয় জানিস না। কোনো বড় কাজের জন্য ঈশ্বর অন্তরাল থেকে তিল তিল করে তৈরি করছে তোকে। না-হলে কারো সাহায্য ছাড়াই ইংলন্ডের মত দেশে বিখ্যাত হওয়া কম কথা নয়। তোর বাগ্মীতায়, যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তোর একজন ভক্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিভাবান ব্যক্তিরাও তোর লেখাগুলো গুরুত্ব দিয়ে শুধু পড়ে না, চিঠি লিখে প্রশংসাও করে। রাস্কিন স্কুলের ছোট গণ্ডিতে যে তোকে ধরে না বারবার তুই দেখিয়েছিস। তুই অনেক বড় হবি দিদি।

মে স্তুতি চাই না। প্রশংসার লোভে কাজ করি না। কাজ করে আনন্দ পাই। কাজ করতে আমার ভাল লাগে।

তোর ভাললাগা যখন অন্যের আনন্দ হয়ে ওঠে, তখন আমরাও তার গর্বে গর্বিত হই। এমন একজন অসাধারণ মেয়ের বোন হতে পারার জন্য গর্ব হয়, শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় মনটা নুয়ে আসে।

তাই বুঝি। তার দিকে বিদ্যুৎ কটাক্ষ হেনে হাসল মার্গারেট। আনন্দে তার গালটা টিপে ধরে বলল : হয়েছে! এবার স্কুল যেতে হবে বুঝেছ।

ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেন আর মানুষ প্রতিমুহূর্ত নীরবে নিভৃতে নিজেকে অবিরাম সৃষ্টি করে চলেছে। বিধাতার মত সেও একজন স্রষ্টা। তার ভেতর এই সৃষ্টির যাত্রা তাকে শান্ত থাকতে দেয় না। প্রতিদিনের নানা ঘটনার মধ্যে অজান্তে সে আর এক মানুষ হয়ে ওঠে। এই অয়ন পথটা সে নিজেও ভাল করে জানে না! মার্গারেটও বোঝে না অলক্ষ্যে তার আয়োজনটা কী হলে কি হয়?

এখন তার বয়স আঠাশ। কম দিন তো হল না। অতদিনের সব কথা মনে থাকার কথা নয়। তবু মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে হয় গোটা অতীতটাকে মনে করতে। মনে করতে না পারলে কতখানি এগোল এত বছর ধরে তার পরিমাপ করা হবে না। একজন মানুষ তো জীবনভোর পথ চলে কোনো কিছু প্রত্যাশা নিয়েই। সব মানুষই তাই করে। সমস্ত সাফল্যের মধ্যেই তার পথ চলার অফুরন্ত গতি নিহিত থাকে। তবু সব সফল মানুষের কিছু কিছু ব্যর্থতা থাকে। অপ্রাপ্তিকে প্রাপ্তিতে ভরিয়ে তুলবার জন্য এই শূন্যময়তার দরকার হয়। শূন্যময়তার বিষাদে ডুবে গিয়ে কেউ হারিয়ে যায় আবার। তখন তার কোনো গন্তব্যই থাকে না। আর যে সব বিষাদ, অবসাদ, যন্ত্রণার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছল লোকে বলবে জিতল সেই। এখনও অনেক পথ চলা আছে জীবনে। সব পথটুকু পাড়ি না দেয়া পর্যন্ত কেউ সাফল্যের দাবি করতে পারে না। তবু মুক্তির স্বাদ নিতে নিতে যতটা পথ পরিক্রমণ করল বুকের মধ্যিখানে তার স্মৃতিটুকু থাকে — তার দাবিদার হতে না পারলে পথশ্রান্তি বেশি বোধ হয়। এই অনুভূতির কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে মার্গারেট একবার দেখল নিজেকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখার মত রোমাঞ্চকর সে অনুভূতি। অজান্তে মন ভেসে যায় কোন সুদূরে। মার্গারেট বহু বছর পেছনে তার ছোটবেলার দিনগুলোর মধ্যে ফিরে যাচ্ছিল। কিসের

টানে কেন যে অতীত চারণ করছিল নিজেও জানে না। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, চাপ চাপ সবুজ ঘাসের উপর ধ্যানস্থ দেবী প্রতিমার মত বসে আছে। পরনের সাদা স্কার্টের ঘেরটা গোলাকৃতি হয়ে এমনভাবে ঘাসের ওপর বিছানো দেখলেই মনে হয়। শুভ্র পদ্মের উপর দেবী ভেনাস উদ্যান আলো করে বসে আছেন যেন। সৌন্দর্যের দেবীর দু'চোখে বিভোর বিহ্বলতা। অপাপবিদ্ধ চোখের উৎসুক চাউনিতে ভালোবাসা এবং মমতার নির্ঝর। পিতামহী নীলাস তাকে দেখে থ হয়ে যায়। নাতনীর চোখের ওপর মুগ্ধ দুটি চোখ রেখে দেখতে লাগল। মনে হল মার্গারেটের মধ্যে যীশুকে দেখেছে। সমগ্র সত্তার মধ্যে যীশু এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে যেন। বোধ হয় চারপাশের প্রকৃতিই ঈশ্বরের এক অদৃশ্য শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করেছে তাকে। গভীর এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয় নীলাসের। গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে যায় কণ্ঠস্বর। অস্ফুট গলায় ডাকল : মার্গারেট! তোকে কোন নামে ডাকব আমি? তুই মেরিও না, ভেনাসও না, যীশুও না। তাহলে তুই কে?

ঠাকমার কথায় ধাঁধা লাগল তার। বলল : ঠাকমা তোমার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামছে। কেন? কী হয়েছে তোমার? এত ভালবাসা, এত প্রীতি, এত আদর, চতুর্দিকে এত খুশি, এত প্রাণের মেলা — এসব দেখে কি কারো কান্না আসে? চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিলে ঈশ্বরের করুণা, তার অপার মমতা, কানভরা সব সুর দেখবে শুনবে কেমন করে? মনটা আপনা থেকে দীন হয়ে আসে। মাথা হেঁট হয়ে যায় সেই পরম করুণাময়, অমৃতময় পুরুষের পদতলে। এই অনুভূতির ভেতর যীশুকে পাওয়া হয়।

নাতনীর হাত ধরে উদ্যানটা পাক দিতে দিতে নীলাস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মার্গারেটের দিকে মুগ্ধ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। উইলো গাছের পাতার মত শিশু মার্গারেটের নিটোল মসৃণ মুখ, তার সরল নিষ্পাপ দুই চোখ মেলে নীলাস মার্গারেটকে দেখতে লাগল। বিগলিত কণ্ঠে বলল : কত অসাধারণ জিনিস কত অসামান্য হয়ে ওঠে তোর চোখে। যীশুর অপার করুণা তোকে একদিন মস্ত মানুষ করে দেবে। যীশু বলতেন আমি বলিদান চাই না, চাই দয়া। মায়া, মমতা ছাড়া দয়া হয় না। তোর বুকে যীশুর দয়া, মায়া আর মমতা।

যীশুর কথা উঠতেই মার্গারেট বায়না ধরল : ঠাকমা, আমাকে যীশুর গল্প বল। যীশু তো মেরি মায়ের ছেলে। মানুষকে তিনি তো ভালবেসেছিলেন। তবু মানুষ হত্যা করল তাঁকে। কী দোষে নিহত হল মানুষের প্রাণের ঠাকুর?

ওরা একটা ওক গাছের নিচে বসল। শেষ বিকেলের আলো পুণ্যের মত ঝরে পড়ছিল ওদের মুখে। বাতাসে ফুলের সুগন্ধ। নীলাসের মনে হল এসব হয়তো যীশুর ইচ্ছেতে হচ্ছে। অমৃতময় পুরষের জীবনের স্মৃতিচারণের এক আশ্চর্য মুহূর্ত যেন প্রকৃতি রচনা করেছে। এক মহৎ ও বিশাল অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে গেল নীলাসের অন্তঃকরণ। অভিভূত গলায় বলল : যীশুর মত মানুষেরা অপরাধ করে না, অপরাধী তাদের করা হয়। যীশু শুধু মানুষের ভাল চেয়েছিল। বিপদে, আপদে দুঃখে, দারিদ্র্যে যে মানুষ অসহায়, জীবজন্তুর মত খেয়ে না খেয়ে বেঁচে আছে সেই মানুষগুলোকে মানুষের অধিকার এবং মর্যাদা দিয়ে মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্য তাদের অন্তরের সংশয়, দ্বিধা, দুর্বলতা, ভীরুতা জয় করতেই বলেছিলেন। মানুষকে যারা অমানুষ করে রেখেছিল তারা যীশুকে শত্রু ভাবল। তাঁকে হত্যা করার মতলব আঁটল। কিন্তু সব সময়ে প্রচুর লোক ঘিরে থাকে তাঁকে। মতলববাজরা কিছু করার সুযোগ পাচ্ছিল না। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করে তারা যীশুকে ফাঁদে ফেলতে চাইল। কিন্তু তাদের অস্ত্রেই যীশু পরাজিত করল তাদের। তবু হার মানল না তারা। ষড়যন্ত্র চলতে থাকল।

মানুষের মন তো। যীশুর নামে অপপ্রচার কুৎসা নিন্দা শুনতে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের দুর্গে ফাটল ধরল। যীশুও বুঝতে পারলেন মানুষের বিশ্বাসে সন্দেহ, বন্ধুত্বে অবিশ্বাস, প্রেমে বৈরীতা। একদিন মূর্খ জনতা যীশুকে ভয় পেল। অপপ্রচার, মিথ্যের জয় হল। তারাও বলতে আরম্ভ করল যীশুর মধ্যে একটা শয়তান আছে। ও রাজদ্রোহী। রাজা হওয়ার লোভে তাদের বিপথে টানছে। ভেল্কিবাজি করে নিজেকে মহিমান্বিত করছে। যীশুর হয়ে একজনও এইসব অভিযোগের প্রতিবাদ করল না।

যীশু আশ্চর্য হলেন না। আবার মানুষের ওপর নির্দয়ও হলেন না। ভক্ত এবং অনুরাগীদের মন টেনে নিতে, তাদের ব্যাকুল করতে বললেন : আমার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। অনেক কিছুই ঘটবে জীবনে। তোমাদের ধরে নিয়ে যাবে, নির্যাতন করবে, কয়েদ করবে। আমার জন্যই তোমাদের এসব যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। এটা আমার যেমন দুঃখ, তেমন এক পরম প্রাপ্তিও বটে। সেই দিনই তোমরা অনুভব করবে কোনো কোনো ঘটনা বাইরে থেকে যা দেখায় তাই তার যথার্থরূপ নয়। একই ভালবাসা যা মানুষকে স্বর্গের ছবি দেখায়, তারই আবার এমন রূপ আছে যা মানুষকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। বাইরে থেকে উভয়কে দেখতে একই, যেন দুই যমজ ভাই, একজন প্রাণ দেয় অন্যজন হরণ করে! তবু বলছি ভয়ে ভীত হয়ো না মানব। বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে তোমরা বাঁচবে। যুদ্ধ বা বিপ্লবের কথা শুনে ভয় পেও না।

এসব জিনিস ঘটবেই। কিন্তু সেটাই পৃথিবীর শেষ অবস্থা নয়। জন্মান্তরের আগের মুহূর্ত।

যীশুর কথা কেউ শুনল না। যে জনতা, যাজক আর শাস্ত্রীদের ভয় পায়, তারাই তাদের পক্ষে যোগ দিল। অথচ এদের মুক্তির জন্য, সুখের জন্য কত কী করলেন, তবু তারা বিপক্ষে দাঁড়াল। শেষবারের মত তাদের ফেরানোর জন্য বললেন : তোমরা ঘুমিয়ে থাকলে বিশ্বাসঘাতকরা মানবপুত্রকে হত্যা করবে। তোমরা জাগ, যে মানুষটি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে সেই লোকটি তোমার আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা চোখ বুজে আছ বলেই দেখতে পাচ্ছ না তাকে।

সেই সময় যুদা এল। যীশুর বিশ্বস্ত বারোজন শিষ্যদের একজন ছিল সে। সশস্ত্র লোকদের সঙ্গেই ঢুকল। তবু যীশু একটুও বিচলিত হলেন না। প্রেমের আলোয় জ্যোতির্ময় তিনি। যুদা অর্থের লোভে ধরিয়ে দিল তাঁকে। আগে থেকেই বলে রেখেছিল যাকে সে চুম্বন করবে সেই যীশু।

কে জানত যুদার ভিতরটা এক, বাইরেটা আর এক। তবু যীশু তন্দ্রালু দুই চোখ মেলে তাকে দেখতে লাগল। যুদা তার হাত চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যেরা তাকে ঘিরে ধরল। সদাহাস্যময় দুটি অধর কোণে বাঁকা হাসি। বলল : এখানকার মাটিতে পা দিয়ে জেনেছি, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

কী করে জানলে? যুদা প্রশ্ন করল।

যীশু বলল : প্রেমের আলোয় তোমার অন্তর্লোক আলোকিত হয়নি। তুমি এই বাস্তব জগতের রক্তমাংসের মানুষ। শুধু জানতাম না অর্থের প্রলোভনে তুমি বিবেক হত্যা করতে পার।

যুদা মাথা হেঁট করল এক গভীর অপরাধবোধে। বুকটা তার হাহাকার করে উঠল মুহূর্তের জন্য। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে তখন।

যীশু সৈন্যদের দিকে করুণাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল : আমাকে ধরার জন্য এত লোকজন, তরোয়াল, লাঠি দরকার হল কেন? আমি কী ডাকাত? আমি তো মানুষের মধ্যে থেকেই তাদের বুকে প্রেমের আলো জ্বালাই। পৃথিবীতে প্রেমের আলো সবচেয়ে জ্যোতির্ময়। অপ্রেমের রাহুর ছায়া যখন প্রেমের আলো ঢেকে ফেলল, চারদিক অন্ধকার নামল তখনই আমাকে কয়েদ করতে পারলে।

বিচারের নামে প্রহসন হল। তবু নিয়মমত অভিযুক্ত যীশুকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হল। কিন্তু যীশু কিছু না বলে চুপ করে রইল।

নীলাসের গল্পের মাঝখানে অধৈর্য হয়ে মার্গারেট সরল মনে বলল : যীশু তো ভগবান। মানুষের রোগ, ব্যাধি, যন্ত্রণা, যাঁর স্পর্শেই সেরে যায়, তাঁর মত ক্ষমতাবান মানুষ তো ঈশ্বরের কাছে একটু প্রার্থনা করলেই নিজেকে রাজরোষ থেকে মুক্ত করতে পারতেন।

নীলাস তার নাতনীর দিকে চেয়ে রইল, অনেকক্ষণ। বলল : ভগবান তো স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে আসে না। মানুষই শ্রেষ্ঠ গুণগুলি নিয়ে ভগবান হয়ে যায়। ভগবানের শক্তি ক্ষমতা সে অর্জন করে। প্রেম হল সে শক্তি। যীশুর শক্তিও প্রেম। তিনি প্রেমময়। প্রেমের জ্যোতির্ময় আলো মানুষের অন্তর্লোক আলোকিত হয়ে যায়। তিনি আলোর দূত। এ আলো যে জ্বালাতে জানে তার কাছে সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। মানুষের প্রতি তখন কোনো বিদ্বেষ থাকে না। কিন্তু তবু এই সহজ কথাটাকে মানুষ জটিল করে তুলল। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে যাঁরা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে ভেবেছিল, নশ্বর দেহের মৃত্যুতেই সব চুকেবুকে যাবে, তাবা জানে না আত্মাকে হত্যা করা যায় না, আত্মা মরে না। তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে। কার সাধ্য তার গতিরোধ করে? সাড়ে আঠারশোরও বেশি বছর ধরে তিনি সবার কাছে আরো প্রিয়তর হয়েছেন। এত ভালবাসা আগে কেউ বাসেনি তাঁকে। আজ সব মানুষের প্রভু তিনি। রাজাও হাঁটু গেড়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। মৃত্যুর পাত্রে খৃস্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন। তারপরেও কেটে গেছে কয়েকটা বছর। শ্রদ্ধা, ভালবাসা ভক্তির আলো পড়ে তিনি হয়ে গেলেন মানুষের প্রেমের দেবতা। নিত্যধাম থেকে এলেন মর্তধামে। মানুষের হৃদয়ের সব বন্ধ দরজা ভেঙে তাদের অন্তরে প্রবেশ করলেন। সমগ্র জীবনের বিশ্বাসের সঙ্গে, ধ্যানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে একাকার হয়ে গেলেন। মরুভূমিতে বিশ বছর সাধনা করে যে সত্যোপলব্ধি করলেন তার বাণী প্রচারের সময় আঠারো মাসও পেলেন না। আঠারো মাস ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য কাঁটার মুকুট পরিয়ে যাঁকে অপমান করা হল, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দুঃসহ যন্ত্রণার বেদনা নিয়ে যিনি আর্তকণ্ঠে বললেন : 'হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর কেন আমাকে ত্যাগ করলে?' সেই মানুষ মৃত্যুর আঠার শো বছর পরেও কী দারুণভাবে বেঁচে আছেন মানুষের অন্তরে। তাঁর মাহাত্ম্য শোনার জন্য মানুষ পাগল। তাঁর করুণায়, কৃপায় ধন্য হয়ে যেতে চায়। তিনিই মানুষের জীবন, শান্তি, সুখ, আরাম, তৃপ্তি। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ভিতর দিয়ে আমরা তাঁকে হৃদয়ে লাভ করেছি। কী তাঁর দীপ্তি, কী তাঁর পবিত্রতা! কত দুঃখের দারুণ দহনে সে মূর্তি সোনা হয়ে গেছে।

অভিভূত আচ্ছন্নতায় মার্গারেট কেমন হয়ে গেছিল। বেশ মনে আছে, নীলাস

মমতাভরা হাত দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বুকের ভেতর চেপে ধরল আদরে, সোহাগে, আনন্দে।

ঘরে ঢুকেই মেরি দেখল মার্গারেট গরাদের ওপর মাথা রেখে নীল আকাশের দিকে উদাস চোখে চেয়ে আছে। আর তার দু'গালে জলের ধারার দাগ চিক চিক করছে। মেরি পা টিপে তার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের অন্যমনস্কতার মধ্যে এত বেশি ডুবে ছিল যে মেরি আগমন টের পেল না। মেরি খুব আস্তে তার পিঠে হাত রাখল। মমতা মাখানো গলায় ডাকল — দিদি?

মার্গারেটের সারা শরীরের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল। গহন স্তব্ধতা ভেদ করে সে যেন জেগে উঠল। তার কিছু বলার আগে মেরি ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল : এই দিদি তোর কী হয়েছে? তুই তো আগে এমন ছিলিস না। হঠাৎ ভীষণ বদলে গেছিস। তোকে ভীষণ অচেনা লাগে। কোথায় তোর কষ্ট আমাকে বল না দিদি।

বিব্রতভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য মার্গারেট বলল : কৈ, আমার তো হয়নি কিছু। দিব্যি, আমার মত আছি।

মেরি তার চোখের ওপর চোখ রেখে বলল : মনের মধ্যে কোথায় কী ঘটে যায় কখন, মানুষ নিজেও তা জানে না।

মানুষের মন এক অনাবিষ্কৃত দ্বীপ। গভীরতর রহস্যে ঘেরা সে নির্জন অঞ্চল, মাঝে মাঝে সেখানে ঝড় ওঠে। ঝড়ে সব এলোমেলো হয়ে যায়। তখন মন কী করবে জানা না থাকলে বড় অসহায় লাগে। সেই মুহূর্তে তার আসল আমি, একা আমির সর্বস্ব সম্বল করে মূল প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উত্তর দিতে হয়।

হতাশামথিত লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল মেরির। প্রশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হল : বুঝেছি। ভারতের সন্ন্যাসী লন্ডনে পদার্পণ করার পর থেকে ইংলন্ডের কাগজগুলো কাগজ বিক্রির জন্য সন্ন্যাসীর বক্তৃতা খুব ফলাও করে ছাপছে। ব্যস্ত কাজের মানুষের ঐসব দার্শনিক বুলি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায়? তোর মত কয়েকজন ভাবুকের মাথা খাচ্ছে কেবল।

মার্গারেট মুচকি হেসে বলল : শ্রদ্ধা ছাড়া গুণগ্রাহী হওয়া যায় না মেরি। মানুষটাকে আমি দেখিনি। কিন্তু তাঁর কথা যত শুনছি ততই চুম্বকের মত আমাকে টানছে। দিন দিন ওঁর অনুরাগীর সংখ্যা বাড়ছে। সেসিম ক্লাবের মার্জেসন তাঁর একজন ভক্ত। এত মানুষকে কথায় ভোলানো সহজ কাজ নয়। ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর কথাগুলো এমন সহজ, সরল সংস্কারমুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা যে এ যুগে ধর্মযাজকেরাই করতে

পারে না। কী সুন্দর বললেন : পশুর ধর্ম নেই, ধর্ম শুধু মানুষেরই ঈশ্বরদত্ত সম্পদ। মানুষই তা ধারণ ও পালন করে। মানুষ নিজের মঙ্গলের জন্য এবং সমাজ ও সংসারকে সুস্থ ও সুন্দর করার জন্যই বলে ন্যায়পথে চল, নির্লোভ হও, অন্যের প্রতি দয়াবান হও। সত্যই মানুষকে নির্ভীক করে। একমাত্র এই বোধই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে। ভগবান পশুকে এই অনুভূতি ক্ষমতা দেয়নি। এই উপলব্ধি না হলে সংসার বা সমাজ স্থির থাকতে পারে না। এই শুভবুদ্ধি ধারণ করার অন্য নাম ধর্ম এবং যা কিছুই এর বিপরীত তা শুধু বিপরীত ফল দেবে। এবং তা কখনও ধর্ম নয়, অধর্ম। কথাগুলো খুবই সাধারণ, তবু আমার মন নাড়া দিয়েছে। যে মানুষকে কথা শোনার জন্য এত লোক পাগল হয় সে মানুষটিকে স্বচক্ষে দেখলে আমার অবিশ্বাসী মনটা কিরকম আলোড়িত হয় পরখ করে দেখার জন্য লেডি ইসাবেলের বাড়িতে মানুষের ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা শুনতে যাব। মিসেস মার্জেসন, গভর্নেস মিস উইডম্যান (Wiedeman) কে দিয়ে আমাকে যেতে বলেছেন। ভাবছি স্বকর্ণে তাঁর আলোচনা শুনব।

কৌতুকপ্রিয় মেরি দু'চোখ বড় বড় করে সবিস্ময়ে বলল : এই দিদি, খুব সাবধান। বশীকরণের মন্ত্র জানে সন্ন্যাসী। শুনেছি তাঁর কণ্ঠস্বর হৃদয়বীণার তন্ত্রীতে বেজে যায়। মূর্ছনা তার থামে না। শ্রোতাদের হৃদয় মনকে আলোড়িত করে। বিধাতা তাঁর কণ্ঠে মানুষকে আহ্বান করার শক্তি দিয়েছে।

মেরি আমি তাঁকে দেখতে চাই। তাঁর ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ কতখানি জাদু, কতখানি সত্য আমি যাচাই করে নেব।

দিনটা ছিল নভেম্বর মাসের এক সুন্দর বিকেল। ওয়েস্ট-এন্ডের লেডি ইসাবেল মার্জেসনের ড্রয়িং রুমে ভারতের সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনতে অনেককেই উপস্থিত হয়েছে। মার্গারেটও অভ্যাগতদের মধ্যে বসল। শ্রোতারা অর্ধবৃত্তাকারে বসে আছে। ঘরের মাঝখানে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। ঠিক সময়েই বক্তা শ্রোতাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। লেডি ইসাবেল উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করে দিলেন।

মুগ্ধ অভিভূত দুটি চোখ মেলে মার্গারেট দেখতে লাগল সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসীর মাথায় হলদে রঙের পাগড়ি। পরনে কমলা রঙের বসন। কোমর বন্ধনও হলুদ রঙের। আগুনের লাল আভা পাগড়ি বাঁধা সুন্দর মুখমণ্ডলের ওপর পড়ে তাঁকে আরো জ্যোতির্ময় করে তুলল। তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর স্নিগ্ধ মুখশ্রী মার্গারেটকে আচ্ছন্ন করল। তাঁর চেতনার ভেতর, সমস্ত সত্তার ভেতর এক দিব্য ঐশী পুরুষকে দর্শন করল।

সাগরপারে সেই দিব্যসন্ন্যাসীর সবল ব্যক্তিত্বপূর্ণ আয়ত নয়ন আর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে স্পষ্ট হয়ে উঠল স্বর্গীয় কমনীয়তা। কী সরল নিষ্পাপ আলোয় ধোয়া ওঁর মুখ। কথাটা মনে হতেই মার্গারেটের গায়ে কাঁটা দিল। ভারত সাধকের সেই কোমলকান্ত স্বর্গীয় মুখশ্রীর মধ্যে রাফেলের আঁকা মেরির কোলে বসা যীশুর মুখ দেখতে লাগল। কানায় কানায় ভরে গেল অন্তঃকরণ। শুধু দৃষ্টিপাতমাত্র এরকম কি হতে পারে? মার্গারেট প্রশ্ন করল নিজেকে। এ যেন স্বর্গ থেকে যীশুর রূপ ধরে ঐ সন্ন্যাসী আবির্ভূত হয়েছে তার সামনে। আর তার মন এক আশ্চর্য রহস্যলোকের মধ্যে ঢুকছে।

মার্গারেট দেখল স্বামীজির শান্ত দীপ্ত তেজময় দুটি চোখ তার দিকে প্রসারিত করে দিয়ে সহসা 'শিব শিব' করে উঠল। এই শব্দের অর্থ মার্গারেট জানে না। তবু তার দেহ মন শিহরিত হলে বারংবার। শব্দদ্বয় তার কানের ভেতর সুরের তরঙ্গ সৃষ্টি করল। আনন্দে আত্মহারা গ্রীক দার্শনিক আর্কেমিডস আসল-নকল সোনার আবিষ্কারের সমাধান সূত্র খুঁজে পেয়ে ইউরেকা, ইউরেকা করতে করতে রাজবাড়ির দিকে দৌড়ে গেছিল -- ভারতীয়দের 'শিব' শব্দটি হয়তো অনুরূপ কোনো আবিষ্কারের আনন্দকে প্রকাশ করে। তাই যদি হয় তা-হলে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তার মত সাধারণ রমণীর মধ্যে এমন কী দেখল যে শিব শিব করে আনন্দে অধীর হল। শিব কথাটা উচ্চারণের সময় আকাশজোড়া বিদ্যুৎলেখার মত চমকিত হতে লাগল ওয়েস্টএন্ডের বৈঠকখানা। ওঁর দুটি উদাস চোখের স্পর্শ যেন লেগে রইল তার চোখের পাতায়। মার্গারেটের মনে হল সন্ন্যাসী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তার ভিতরটা দেখছে যেন। আর সে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবান্তরের উৎস কোথায় মার্গারেট জানে না। ক্ষণে ক্ষণে তার গায়ে কাঁটা দিল। এক আশ্চর্য সুখে ও তৃপ্তিতে ভরন্ত কলসের মত তার ভেতরটা ভরে যাচ্ছিল। হঠাৎ এ কোন আলো পড়ল তার মনের উপর? অজান্তেই হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করল। কিন্তু কার কাছে কী প্রার্থনা করবে, তা-তো জানে না। অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারছিল মনের ওপর আলো পড়ে মনটাই উজ্জ্বলিত হয়েছে। সমস্ত অনুভূতি উপলব্ধির মধ্যে তার আলোর প্রার্থনা।

বাইরে তখন বিকেল শেষ হয়ে গোধূলি এবং অন্ধকারের মিশ্রণে এক দুর্ভেদ্য রহস্যের আবরণে ঢেকে ফেলেছে। আর ঘরের ভেতর সন্ন্যাসীর সুরেলা কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে প্রাচ্যের অভিনব জীবন দর্শন। সমগ্র মানবগোষ্ঠীর যে শাশ্বত, উদার মর্মবাণী, যে বাণী কোন বিশেষ ধর্মের নীতিকথা নয়, যে বাণী সর্বকালের জন্য সত্য, সর্বলোকের পক্ষে প্রযোজ্য -- সে বাণীই স্বামীজির কণ্ঠ থেকে মহামন্ত্রের মত সঞ্জীবনীরসে সিক্ত

হয়ে উদ্‌গীত হতে লাগল। মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রহরের পর প্রহর ধরে সমবেত শ্রোতৃবর্গ রুদ্ধ নিশ্বাসে তা শুনতে লাগল।

সন্ন্যাসীর কথাগুলো কী গভীর করে টানছিল মানুষকে। কী করে একটা দিনের জন্ম হয় এবং তার অবসান হয় তা নীরবে দেখা এবং অনুভব করার মত সময় ও মন যাদের আছে শুধু তারাই বক্তৃতা শুনতে আসে। আর তন্ময় হয়ে যায়। মার্গারেট ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে শুনছিল, মৃত্যুকে মানুষ আদিতেই জেনেছে। দেহের অমরত্ব সে কখনই আয়ত্ত করতে পারেনি। তথাপি অমরত্বের তৃষ্ণা তার নিরন্তর। মানুষের আত্মনাশ তাও সম্ভবত বাঁচবার তীব্র ইচ্ছার এক দারুণ দিক। কিন্তু অমরত্ব লাভের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা তার আয়ত্তের বাইরে থেকে গেছে। ভারতবর্ষের মুনি ঋষিরা যুগ যুগ ধরে তপস্যা করে জেনেছে আত্মার মৃত্যু নেই। মানুষের আত্মা অবিনশ্বর। আপনাদের সম্মুখে ফায়ার প্লেসে যে আগুন জ্বলছে তার শিখাগুলি নিষ্কম্প ও স্থির হয়ে জ্বলছে। প্রত্যেকটি শিখাকেই একটি অগ্নিশিখা বলে মনে হয় বটে, কিন্তু আসলে প্রতিটি শিখা নিমেষে চোখের পলক পড়ার আগে মরে একটি নতুন শিখার জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু তা এত দ্রুত ঘটছে যে, আমাদের চর্মচক্ষু দিয়ে তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। ক্ষয়পূরণ প্রকৃতির নিয়ম। সেই নিয়ম অনুসারে আমাদেরও নিত্য জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে। এই জীবন প্রবাহের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি বলে আত্মার অমরত্বকে টের পাই না। এজন্য যে পর্যবেক্ষণ উপলব্ধির প্রয়োজন ভারতের ঋষিরা যুগযুগান্তের সাধনায় তার সত্যস্বরূপকে অনুধ্যান করেছেন।

মার্গারেটের ভাবরাজ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি হলো। বুকের মধ্যে একটা উথলে ওঠার ভাব হলো। চোখের তারায় তার অন্তর্ভেদী নিবিড়তা। সন্ন্যাসীর ভাষায় কত সুধা, কী তীর বলবতী ধারা, কী তীব্র তার বেগ, কত ভয়ঙ্করকে সে আঘাত করতে পারে নীরবে নিঃশব্দে। সেই জানার প্রথম অভিজ্ঞতা হলো লেডি ইসাবেল মার্জেসেনের বাড়িতে সন্ন্যাসীর দীপ্ত ভাষণে। সন্ন্যাসীর মুখনিঃসৃত বাক্য ও বাণীর মতো আগে বিবৃত হয়নি কারো বক্তৃতায়। অনেক কথাই তাদের বিধৃত হয়নি আচরণের আন্তরিকতায়। বিশ্বাস ও সত্যের দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের যন্ত্রণার গভীরে ডুবে শ্রোতারা কে কতো নিঃশব্দ আর্তনাদে মাথা কোটে কেউ তা উপলব্ধি করেনি? সন্ন্যাসীর বাক্যে ও আন্তরিকতায় তারা প্রথম জানল জীবনের বাস্তব কী আশ্চর্য অলৌকিক। স্থান কালের ও পরিস্থিতির এই মুহূর্তেই মার্গারেটও নিয়তির এক অমোঘ সঙ্কেতে নতুনরূপে আবির্ভূত হয়। অনেককালের বিশ্বাসের দুর্গে, প্রত্যয়ের প্রাচীর গাত্রে সন্ন্যাসীর

বজ্রগম্ভীর বাক্য প্রতিধ্বনিত হতে হতে তার অন্তঃকরণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল নতুন এক সত্যানুভূতিতে।

স্বপ্নের ভেতর মগ্ন হয়ে বসে রইল মার্গারেট ওয়েস্টএন্ডের বৈঠকখানায় উপবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখদুটো আপাদমস্তক গেরুয়া বসনে আবৃত সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যদৃপ্ত উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের উপর স্থির হয়ে রইল। সন্ন্যাসীর মুখ নিঃসৃত সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি বাঁশির সুরের মতো মন্দ্রিত হতে লাগল তার কানের পর্দায়। কী মিষ্টি কী মধুর সেই স্বর! খৃস্টীয় ধর্মবিশ্বাসী মার্গারেটের কানে তা গির্জায় প্রচলিত গ্রেগরির সুরে প্রার্থনার মতো বোধ হতে লাগল দূরাগত ঐ প্রার্থনা সঙ্গীতের অর্থ সে জানে না। কিন্তু তার চেতনার ভেতর সমস্ত সত্তার ভেতর ভাবের ঐশ্বর্য, ভাষার। মাধুর্য সমস্ত সত্তার ভেতর ঈশ্বরের অনন্ত মহিমার অস্তিত্ব অনুভব করে যা গ্রেগরির সুরে ও শব্দের ঝঙ্কার থেকে আলাদা মুহূর্তে একটা মহৎ উদার পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মার্গারেটের সমস্ত চেতনা। আর তীব্র একটা আবেগে তার অন্তরটা যেন বিরাট আদিত্যবর্ণ এক অখণ্ড জ্যোতির্ময় সত্তার কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য অনুভূতিতে তার সারা শরীর কেমন অবশ হয়ে এল। হঠাৎ তার মনে হলো জীবনে এই প্রথম এবং হয়তো শেষ একজন শুদ্ধ ভক্তি ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের দৈবী পুরুষের সান্নিধ্য পেল। নিজের মনের ভেতর ডুব দিয়ে কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তার দিকে তাকিয়ে ঈশ্বর বিশ্বাসী মনটা নিঃশব্দ গলায় বলল : সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে স্বপ্নের রাজপুত্র এসেছে গোটা ইংলন্ডের মানুষকে নরনারায়ণের সেবায় নিবেদিত করতে। তার সমস্ত মর্মের ভেতর তাঁর আহ্বান আগমনের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল সে। ভাবনাটা মার্গারেটের চেতনার ভেতর মধুর একটা আবেশ ছড়িয়ে দিল। চোখ দুটো বন্ধ করে পূজারিণীর মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। হঠাৎই মুখ থেকে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে এল : রাজা! আমার রাজা!

সেদিন বাড়ি ফিরে রাতে ঘুমুতে পারল না মার্গারেট। ঘুম এল না চোখে। ঘরে টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছিল। মার্গারেট নিস্প্রভ আলোর উপর চোখ রেখে সারাক্ষণ জেগে রইল। লেপের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতে ভালো লাগছিল। লেডি ইসাবেলের বৈঠকখানার অভিজ্ঞতা চেপে রেখে সুস্থ থাকা তার মুশকিল হচ্ছিল। পাশে ছোট বোন যে অঘোরে ঘুমোচ্ছে! তার দিক থেকে একহাত দূরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে। ভেতরটা তার এত অধীর যে, ইচ্ছে করল মে-র দিকে সরে গিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরে। মাঝরাতে তার ঘুম নষ্ট করে মনের কথাটা

বলতেও সংকোচ হলো তার। এমন কি ওর গায়ের উপর হাত রাখতে গিয়েও হাতখানা সরিয়ে নিল। ভিতর থেকেই তার প্রতিরোধ এল। অস্থিরমতি মেয়েটাকে তিরস্কার করে বলল : মার্গারেট, এখন তোমার বয়স আঠাশ। ষোড়শী তরুণীর চাপল্য কিংবা ভাবাবেগ এ বয়সে মানায় না। এ বয়স কিছু না বুঝে ঝাঁপ দেয়ার বয়স নয়। এ হলো হিসেব করার বয়স। অমনি মার্গারেট ধমকাল নিজেকে। এই মিথ্যে আচরণ করা অন্যায়। এ পাপ। সত্যিই তো এ ধরনের চিত্ত দৌর্বল্য মানায় না তাকে। দেবতার কাছে উৎসর্গীকৃত সে। যীশুর সেবক। ছোট থেকে সেইভাবে তৈরি করেছে মনকে। তাই আর পাঁচজন রমণীর মতো নারী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে তার ধারণাটা খুব অস্পষ্ট। হঠাৎই কুয়াশার ভিতর থেকে একটু একটু স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাই বোধহয় নিজেকে অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছিল।

চোখ বুজল মার্গারেট। ও অন্ধকারের মধ্যে দৈববাণীর মতো শুনতে পেল সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরানো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ইংরেজিতে স্বামীজি তার ব্যাখ্যা করলেন, এই আত্মা শাশ্বত এবং পুরাতন। শরীরের মৃত্যু হলেও সে মরে না। সে থাকে হন্যমান এ শরীর মাঝে যারা অজয় অমর সত্তার সম্ভার/পদে পদে গায় অসম্ভবের গান। তাই শুনতেই আজো পেতে আছি কান।' মার্গারেটের বন্ধ চোখ দুটি আস্তে আস্তে মেলল। সত্যিই বাস্তব কী আশ্চর্য। জীবন কী অসম্ভবের সম্ভাবনায় পূর্ণ। তা না হলে এমন করে এসব কথা মনে হবে কেন? দূরাগত বাণীর মতো তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে সেতারের মধুর ঝঙ্কারের মতো বাজতে লাগল স্বামীজির অভয়মন্ত্র : 'অন্তবন্ত ইসে দেহা নিত্যস্যোক্তা শরীরিণঃ। অনাশিনোহ্ প্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।' মার্গারেট নিজস্ব বিচার বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করল, প্রত্যেক মানুষের শরীর ছাড়াও একটা মন আছে। শরীর ও মনের দ্বন্দ্ব নিত্য লেগে আছে। মন থাকলেই তার নানারকম প্রতিক্রিয়াও থাকবে। এ থেকে কোনো মানুষ মুক্ত নয়। মুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয় তাকে। মনের সঙ্গে নবীন হয়ে ওঠার সংগ্রাম বোধ হয় শুরু হয়ে গেছে তার ভেতরে। সেজন্য এত বেদনা নিয়ে এত রক্তক্ষরণ হয়?

মার্গারেটের চোখে ঘুম নেই। গভীর ভাবনায় পেয়েছে তাকে। আধো আলো অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গিয়ে সে অনুভব করল, ফুলের কুঁড়ির উপর আলো পড়ে পাপড়িগুলো যখন ফোটে, ফুল জানে না তার ফল ফলাবার নির্দেশ আসছে কোন অলক্ষ্য থেকে। সেও জানে না সাধুসঙ্গ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে? সন্ন্যাসীর বক্তব্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, তাঁর আদর্শের প্রতি অনুরাগ, তাঁর উজ্জ্বল উত্তপ্ত স্বদেশ

প্রেম, তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, তীব্র ভালোলাগা তার সমস্ত চেতনার ভেতর মোমের মতো গলে গলে পড়তে লাগল।

এই অনুভূতি মার্গারেটের নতুন। আসলে জীবন সম্পর্কে তার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছে জীবনের আঠাশ বছরে বাদে। এই কৌতূহলী উৎসুক মনটি ভারতের মহাযোগীর সৃষ্টি। তাঁর প্রভাবের আলো পড়ে এক নতুন মার্গারেটের জন্ম হচ্ছে তার ভেতর। বহুকালের সংস্কার, বিশ্বাসের মধ্যে এ কোন বিরোধ সৃষ্টি হলো তার? অথচ ওঁর তো কোনো দাবি নেই। উনি শুধু নিজেকে উজাড় করে দিতেই জানেন। তাহলে হৃদয়ের অন্তঃস্তলে এ ঝড় ওঠে কেন? ঠিক সেই মুহূর্তে বুকের মধ্যে সন্ন্যাসীর কণ্ঠে শিব শিব ধ্বনিত হল। সারা শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হল। ঐ ভাষা এবং শব্দের অর্থ সে বোঝে না। তবু এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল। অন্ধকারের মধ্যে সন্ন্যাসীর দিব্যমূর্তি দুটি উজ্জ্বল চোখের ওপর বাঁকা ধনুকের মত দু'খানি ভুরুর রেখা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। চোখ বন্ধ করল মার্গারেট। সন্ন্যাসীর দিকে তাকানোর সাহস নেই তার। তবু চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। আসলে সে যুদ্ধ করছিল নিজের সঙ্গে। কারণ জীবনের আসল কথাই হল মুক্তি। বন্দীত্ব মানুষের সৃষ্টি। দুঃখ, কষ্ট যা ভোগ করে তাও তার নিজের সৃষ্টি। নিজের থেকে তার মূলোচ্ছেদ করতে না পারলে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। মার্গারেটের সহসা মনে হল অন্ধকার থেকে আলোয় প্রত্যাবর্তন করছে সে। তাই এত যন্ত্রণা, এত রক্তক্ষরণ। কথাটা মনে হতেই বেশ একটা স্বস্তি এবং শান্তি অনুভব করল। কেমন একটা অবসন্নতায় এবং শ্রান্তিতে তার দু'চোখের পাতা এক হয়ে এল। ঘুম নামল চোখে। শান্তির ঘুম।